বাংলা ভাষাচর্চা

বাংলা ব্যাকরণ। অষ্টম শ্রেণি

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর, ২০১৫

দ্বিতীয় সংস্করণ: ডিসেম্বর, ২০১৬

গ্রন্থস্বত্ব : পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রকাশক
অধ্যাপিকা নবনীতা চ্যাটার্জি
সচিব, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
৭৭/২ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬

মুদ্রক :
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সটবুক কর্পোরেশন
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬

পর্ষদ-এর কথা

অষ্টম শ্রেণির জন্য নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী বাংলা ব্যাকরণের বই 'বাংলা ভাষাচর্চা' প্রকাশ করা হলো। এই 'বাংলা ভাষাচর্চা' বইটি ব্যাকরণ এবং নির্মিতি অংশ নিয়ে গঠিত। ব্যাকরণ অংশ যেমন ছাত্রছাত্রীদের ভাষাজ্ঞানকে নির্ভুল ও যথাযথ করবে, তেমনি নির্মিতি অংশ সাহায্য করবে তাদের সৃজনশীল লেখালিখির ক্ষেত্রে।

ছাত্রছাত্রীদের প্রেরণা জোগাতে এবং ব্যাকরণের মতো তথাকথিত নীরস বিষয়কে সহজ ও আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দের নিরলস প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরের সমস্ত বিষয়ের বই ছাপিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বিতরণ করে থাকে। এই প্রকল্প রূপায়ণে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষাদপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন নানাভাবে সহায়তা করেন এবং এঁদের ভূমিকাও অনস্বীকার্য।

'বাংলা ভাষাচর্চা' বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য সকলকে মতামত ও পরামর্শ জানাতে আহ্বান করছি।

ডিসেম্বর, ২০১৬
৭৭/২ পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০১৬

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়
সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রাক্‌কথন

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন করেন। এই 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-র ওপর দায়িত্ব ছিল বিদ্যালয়স্তরের সমস্ত পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক-এর পর্যালোচনা,পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া পরিচালনা করা। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক রচিত হলো। আমরা এই প্রক্রিয়া শুরু করার সময় থেকেই জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ (NCF 2005) এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ (RTE 2009) এই নথি দুটিকে অনুসরণ করেছি।

অষ্টম শ্রেণির 'বাংলা ভাষাচর্চা' পুস্তকটি ব্যাকরণ এবং নির্মিতি অংশ নিয়ে গঠিত। চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্রেণির 'বাংলা ভাষাপাঠ' বইগুলির সম্প্রসারণ উচ্চ-প্রাথমিকের এই বই। বাংলা পাঠ্যপুস্তকের সম্পূরক এই পুস্তকে ব্যকরণের ধারণা এবং বিবিধ প্রয়োগকে শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও পদ্ধতির উপর নির্ভর করে আমরা ব্যাকরণচর্চার অভিমুখের পরিবর্তন আনতে চেষ্টা করেছি।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রস্তুত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যশিক্ষার সারস্বত নিয়ামক মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। তাঁদের নির্দিষ্ট কমিটি বইটি অনুমোদন করে আমাদের বাধিত করেছেন। এই প্রকল্প রূপায়ণে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন,পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রভূত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত, পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

অভীক মজুমদার

চেয়ারম্যান
'বিশেষজ্ঞ কমিটি'
বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ডিসেম্বর, ২০১৬
নিবেদিতা ভবন, পঞ্চম তল
বিধাননগর, কলকাতা ৭০০ ০৯১

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

সদস্য

অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি) রথীন্দ্রনাথ দে (সদস্য-সচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

অধ্যাপিকা নবনীতা চ্যাটার্জি (সচিব, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ)

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

ঋত্বিক মল্লিক সৌম্যসুন্দর মুখোপাধ্যায় রুদ্রশেখর সাহা

মিথুন নারায়ণ বসু ইলোরা ঘোষ মির্জা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

অলয় ঘোষাল

পুস্তক নির্মাণ

বিপ্লব মণ্ডল

ব্যাকরণ

দল ১

ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ ও ধারা ৪

বাক্যের ভাব ও রূপান্তর ১৩

বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া ২১

ক্রিয়ার কাল ২৭

সমাস ৪০

সাধু ও চলিত ৫৩

নির্মিতি

বাংলা প্রবাদ ৫৯

এক শব্দের একাধিক অর্থে প্রয়োগ ৬২

পত্রলিখন ৬৮

প্রবন্ধ রচনা ৭১

প্রথম অধ্যায়

দল

বাগ্‌যন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে কোনো শব্দের যেটুকু অংশ উচ্চারিত হয়, তাকে দল বা অক্ষর (Syllable) বলে। এখানে স্বল্পতম প্রয়াসের অর্থ হলো, ঝোঁক। অর্থাৎ একটি শব্দ উচ্চারণ করার সময় যতবার ঝোঁকের প্রয়োজন হয়, তাতে ততগুলি দল বা অক্ষর থাকে। আবার কোনো কোনো শব্দ একবারেই উচ্চারিত হয় বা একটিই ঝোঁক থাকে; অর্থাৎ তাদের মধ্যে একটিই দল বা অক্ষর থাকে। কয়েকটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট করা যাক— যেমন : 'ব্যাকরণ' শব্দটি উচ্চারণ করতে তিনবার ঝোঁক দিতে হয়, ব্যা-ক-রণ্। ঠিক একইভাবে—

মাছ— মাছ্	(একটি দল)
দল— দল্	(একটি দল)
ছন্দ— ছন্-দ	(দুটি দল)
বাংলা— বাং-লা	(দুটি দল)
সম্মোহন—সম্-মো-হন্	(তিনটি দল)
কলকাতা—কল্-কা-তা	(তিনটি দল)
ভারতবর্ষ— ভা-রত্-বর্-ষ	(চারটি দল)
রবীন্দ্রনাথ— র-বীন্-দ্র-নাথ্	(চারটি দল)
বিবেকানন্দ—বি-বে-কা-নন্-দ	(পাঁচটি দল)

উপরের উদাহরণগুলি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় এক বা একাধিক দল নিয়ে শব্দ গড়ে ওঠে। আর শব্দ যেমন একদল বিশিষ্ট হয়, তেমনই বহুদল বিশিষ্টও হয়ে [যেমন : পাখি (দুটি দল বিশিষ্ট), ধান (একদল বিশিষ্ট)] থাকে। এই দলকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় — ১. স্বরান্ত বা মুক্তদল (Open Syllable),২. ব্যঞ্জনান্ত বা রুদ্ধদল (Closed Syllable)।

১. **স্বরান্ত বা মুক্তদল :** যে দলের শেষে স্বরধ্বনি থাকে বা যে দলে একটিই স্বরধ্বনি, তাকে স্বরান্ত বা মুক্তদল বলে। যেমন : আসে — আ-সে—এখানে দুটি দলই স্বরান্ত বা মুক্তদল। শেষে স্বরধ্বনি থাকায় এদের উচ্চারণ প্রলম্বিত হয়, তাই এরা মুক্ত দল।

২. **ব্যঞ্জনান্ত বা রুদ্ধদল :** যে দলের শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি থাকে তাকে ব্যঞ্জনান্ত বা রুদ্ধদল বলে। যেমন : দুষ্ট — দুষ্-ট— এখানে ‘দুষ’- রুদ্ধ দল এবং ট - স্বরান্ত বা মুক্তদল। একইভাবে ‘মন্’, ‘মাছ’, ‘বল’, ‘চল’, ‘রাগ’ প্রভৃতি সব কয়টিই ব্যাঞ্জনান্ত বা রুদ্ধদল। রুদ্ধদলের পরে আর কোনো ধ্বনি যুক্ত করা যায় না, তাহলেই দুটো দল হয়ে যায়। যেমন : মন্ + টা = মনটা (দুটি দল, মন - রুদ্ধদল/টা - মুক্তদল)

স্বরধ্বনিগুলির মধ্যে অ, আ প্রভৃতি পূর্ণস্বর মুক্তদলের এবং আর, আউ, আও প্রভৃতি যুক্তস্বর রুদ্ধদলের মধ্যে পড়ে অন্যভাবে বলা যায়, যে পূর্ণস্বরের শেষে কোনো খণ্ডস্বরকে জায়গা দেওয়া গেলে তা মুক্তস্বর। কিন্তু যে পূর্ণস্বরের শেষে কোনো খণ্ডস্বর থাকায় আর কোনো খণ্ডস্বরকে জায়গা দেওয়া যায় না তা রুদ্ধদল। যেমন- ‘দা’ দলে খণ্ডস্বর হিসেবে ‘ও’ যুক্ত হতে পারে। তাই ‘দা’-মুক্তদল। কিন্তু ‘দাও’- দলে খণ্ডস্বর হিসেবে আর কোনো ধ্বনি যুক্ত হতে পারে না। তাই ‘দাও’ রুদ্ধদল।

এবার বিভিন্ন শব্দের দলের সংখ্যা এবং শ্রেণিবিভাগ নির্ণয় করা যাক :

আমার	→	আ - মার্ (দুটি দল : আ - মুক্তদল, মার্ - রুদ্ধদল)
আশৈশব	→	আ - শৈ - শব্ (তিনটি দল : আ - রুদ্ধদল, শৈ - রুদ্ধদল, শব - রুদ্ধদল)
গ্রামবাসী	→	গ্রাম্ - বা - সী (তিনটি দল : গ্রাম - মুক্তদল, বা - মুক্তদল, সী - মুক্তদল)
চন্দ্রবদনা	→	চন্ - দ্রো - ব - দ- না (পাঁচটি দল : চন্ - রুদ্ধদল, দ্রো - মুক্তদল, ব - মুক্তদল,দ- মুক্তদল, না - মুক্তদল)
নির্মূল	→	নির্ - মূল (দুটি দল : নির্ - রুদ্ধদল, মূল - রুদ্ধদল)
ভৈরব	→	ভৈ-রব্ (দুটি দল : ভৈ - রুদ্ধদল, রব্ - রুদ্ধদল)
ভুল	→	ভুল্ (একটি দল : ভুল্ - রুদ্ধদল)
মনচোরা	→	মন্ - চো - রা (তিনটি দল : মন্ - রুদ্ধদল, চো - মুক্তদল, রা - মুক্তদল)

---

১. **ঠিক বিকল্পটি বেছে নিয়ে বাক্যটি আবার লেখো :**

১.১ ব্যাকরণে দল শব্দটির অর্থ—

(ক) অক্ষর (খ) পাপড়ি (গ) জনতা (ঘ) বর্ণসমষ্টি।

১.২ আমি অষ্টম শ্রেণিতে পড়ি। বাক্যটিতে মোট দলসংখ্যা হলো

(ক) ৪টি (খ) ৭টি (গ) ৯টি (ঘ) ১০টি।

১.৩ 'উচ্চারণ' শব্দটির দল বিশ্লেষণ করলে হবে—

(ক) উ-চ্চারণ (খ) উচ্-চা-রণ (গ) উদ্-চারণ (ঘ) উচ্চা-রণ।

২. **নির্দেশ অনুযায়ী নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :**

২.১ 'দল' কাকে বলে?

২.২ দলের শ্রেণিবিভাগগুলি নির্দেশ করো।

২.৩ তিন রুদ্ধদল বিশিষ্ট একটি শব্দের দল বিশ্লেষণ করো।

২.৪ তিনটি দল রয়েছে এমন একটি শব্দ লেখো।

২.৫ মুক্তদল বলতে কী বোঝ?

২.৬ রুদ্ধদল-এর এমন নাম হওয়ার কারণ কী?

২.৭ হলন্ত শব্দ কাকে বলে?

২.৮ মুক্তস্বর কী?

২.৯ রুদ্ধস্বর বলতে কী বোঝ?

২.১০ মুক্ত দলকে স্বরান্ত অক্ষর বলা হয় কেন?

৩. **নীচের শব্দগুলির শেষ দলগুলির মধ্যে কোনটি রুদ্ধদল, কোনটি মুক্তদল তা লেখ :**

ব্যাকরণ	
জলছবি	
বাসযাত্রী	
তাৎপর্য	
পাকারাস্তা	
অকালবোধন	
সমাধান	
নবেন্দু	
টেনিদা	
কবিতা	

৪. **নীচের শব্দগুলির 'দল' বিশ্লেষণ করে কোন শব্দে কটি 'দল' আছে নির্দেশ করো :**

ধানদুর্বা, শ্যামলিমা, কণ্ঠস্বর, নৌকাডুবি, পাঁচফোড়ন, শীর্ষেন্দু, ধাঁধা, শেষ, আকাশপাতাল, আকস্মিক, বাতাস, অরণ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধ্বনি পরিবর্তন

আমাদের মধ্যে অনেকেই ‘স্কুল’-কে বলি ‘ইস্কুল’, ‘গ্লাস’-কে ‘গেলাস’ কিংবা ‘বাক্স’ না বলে ‘বাস্ক’, ‘পিশাচ’ না বলে ‘পিচাশ’। কেন এমন হয়? এর পিছনে কি কোনও কারণ আছে, এমন বদলে যাওয়ার আছে কি নিজস্ব নিয়ম-নীতি? সে প্রশ্নের জবাব খোঁজার আগে আর একটি শব্দকে দেখা যাক। ‘বিলাতি’, এই একই শব্দকে ‘বিলেতি’ বা ‘বিলিতি’ বললে-লিখলেও কোনও মহাভারত-অশুদ্ধ হবে না। কিন্তু হঠাৎ পাল্টানোর প্রয়োজনটা পড়ল কেন, এই প্রশ্ন যদি তোমার মনে ঘুরপাক খায় তবে চতুর্থ শ্রেণির ‘ভাষাচর্চা’ বইটি একবার খুলতে হবে। তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে ‘ই’ উচ্চ স্বরধ্বনি আর ‘আ’ নিম্ন স্বরধ্বনি, অর্থাৎ, এই ধ্বনিগুলি উচ্চারণের সময় জিভ যথাক্রমে উপরে আর নীচে থাকে। এখন ‘বিলাতি’ বলার সময় জিভকে ই-আ-ই, অর্থাৎ উচ্চ-নিম্ন-উচ্চ অবস্থানে যেতে হয়। এই পরিশ্রম বাঁচানো যায় নিম্ন স্বরধ্বনিকে মধ্য-স্বরধ্বনিতে বদলে নিলে, অর্থাৎ, ই-এ-ই, ‘বিলাতি’ তাই হলো ‘বিলেতি’, আর ‘বিলিতি’ বললে তো আরোই সোনায় সোহাগা, জিভের খাটনি তখন কমবে সবচেয়ে বেশি।

ধ্বনি পরিবর্তনের মূল কারণ এইটিই, অর্থাৎ, উচ্চারণের সরলীকরণের প্রতি বাগযন্ত্রের সহজাত প্রবণতা। উচ্চারণস্থান-অনুযায়ী কাছাকাছি ধ্বনিগুলির সন্নিবেশ করে নিতে চাই আমরা। শক্ত উচ্চারণকে এভাবেই শব্দের অন্তর্গত বিভিন্ন ধ্বনিকে পরিবর্তনের মাধ্যমে সহজ করে নিতে চাই। শব্দের অর্থ এতে অক্ষুণ্ণই থাকে, কিন্তু ধ্বনিতাত্ত্বিক দিক থেকে, শব্দের বহিরঙ্গে ঘটে নানা রূপান্তর। ব্যাকরণে ও ভাষাতত্ত্বে এই বিষয়টিকেই বলা হয় ধ্বনি পরিবর্তন। ধ্বনি পরিবর্তনের পর্যায়টি আকস্মিক নয়, একটি ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের উচ্চারণ-প্রবণতার অনুসারী এবং দীর্ঘমেয়াদী। ভাষার বিবর্তনের ইতিহাসের সঙ্গে তার যোগ।

ধ্বনি পরিবর্তনের তিনটি ধারা, যথাক্রমে : (ক) ধ্বনির আগম, (খ) ধ্বনি লোপ এবং (গ) ধ্বনির রূপান্তর। মনে রাখতে হবে, ধ্বনি বলতে এখানে স্বর ও ব্যঞ্জন, উভয়কেই বোঝানো হচ্ছে। স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির আগমকে যথাক্রমে স্বরাগম ও ব্যঞ্জনাগম, স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির লোপকে যথাক্রমে স্বরলোপ ও ব্যঞ্জনলোপ এবং স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির রূপান্তরকে যথাক্রমে স্বরসংগতি এবং ব্যঞ্জনসংগতি বা সমীভবন বলা হয়ে থাকে।

ধ্বনির আগম

আগেই বলা হয়েছে ধ্বনির আগমকে প্রধান দুটি ভাগে ফেলা যায়, স্বরাগম ও ব্যঞ্জনাগম। আমরা প্রথমে স্বরের আগম নিয়ে আলোচনা করব, তারপরে আসব ব্যঞ্জনাগমের কথায়।

● **স্বরাগম :** শব্দের আদি, মধ্যে বা অন্তে সংযুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে তার আগে, পরে বা মধ্যে একটি স্বরধ্বনির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে উচ্চারণ প্রয়াস হ্রাস করার প্রক্রিয়াকেই বলা যায় স্বরাগম। সহজেই বোঝা যাচ্ছে, স্বরাগম হতে পারে তিন প্রকার। যথাক্রমে : আদি-স্বরাগম, মধ্য-স্বরাগম এবং অন্ত্য-স্বরাগম।

১. আদি স্বরাগম : শব্দের শুরুতেই যুক্তব্যঞ্জন থাকলে উচ্চারণের সুবিধার্থে যুক্তব্যঞ্জনটির পূর্বে একটি সুবিধাজনক স্বরধ্বনির আগম ঘটে। একেই বলা হয় আদি-স্বরাগম। যেমন : স্পর্ধা > আস্পর্ধা, স্টেশন > ইস্টেশন ইত্যাদি।

২. মধ্য-স্বরাগম : শব্দের মধ্যে যুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে উচ্চারণ প্রয়াস কমানোর খাতিরে, সরলীকরণের প্রয়াসে অথবা ছন্দের কারণে যুক্ত ব্যঞ্জন দুটির মধ্যে একটি স্বরধ্বনির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে শব্দের সৌকর্য বৃদ্ধির রীতিকে বলা যায় মধ্য-স্বরাগম। এইখানে স্বরধ্বনি-সহযোগে যুক্তব্যঞ্জনকে বিভক্ত করা হয় বলে মধ্য-স্বরাগমের অপর নাম 'স্বরভক্তি'। আবার এই প্রক্রিয়ায় শব্দের সৌকর্য তথা উৎকর্ষকে বিশেষরূপে ও প্রকৃষ্টভাবে বর্ধিত করা যায় বলে এই প্রক্রিয়াকে 'বিপ্রকর্ষ'-ও বলা হয়ে থাকে।

সচরাচর যেসব শব্দে 'র', 'ল', 'ন' ও 'ম' সংযুক্ত হয়ে যুক্তব্যঞ্জন তৈরি করছে স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষের বিশেষ প্রবণতা দেখা যায় সেখানেই। যে স্বরধ্বনিগুলির আগম তার মধ্যে পড়ে : অ, ই, উ, এ এবং ও। যেমন ; কর্ম > করম, নির্মল > নিরমল, বর্ষণ > বরিষণ, মুক্তা > মুকুতা, গ্রাম > গেরাম, শ্লোক > শোলোক ইত্যাদি।

৩. অন্ত্য স্বরাগম : শব্দের অন্তে যুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে উচ্চারণের শ্রম কমাতে ও উচ্চারণের আড়ষ্টতাকে সহজ করার জন্য অতিরিক্ত যে স্বরধ্বনির আগম ঘটে, তাকে অন্ত্য-স্বরাগম বলা হয়। যেমন : নস্য > নস্যি, দুষ্ট > দুষ্টু, সত্য > সত্যি, বেঞ্চ > বেঞ্চি ইত্যাদি।

● **ব্যঞ্জনাগম :** শব্দের মধ্যে অনেক সময় বাইরে থেকে একটি ব্যঞ্জন ধ্বনি এসে জায়গা করে নেয়। একে বলে ব্যঞ্জনাগম। স্বরাগমের মতোই ব্যঞ্জনাগমও আদি, মধ্য ও অন্ত্য, তিনস্থানেই হতে পারে। তবে বাংলাভাষায় আদি-ব্যঞ্জনাগম প্রায় দুর্লভ।

১. আদি-ব্যঞ্জনাগম : শব্দের আদি ও ব্যঞ্জন ধ্বনির আগম কদাচিৎ ঘটে। বাংলা ভাষার বিশেষ আঞ্চলিক বৈচিত্র্যেই এমন দেখা যায়। যেমন : আম > রাম।

২. মধ্য-ব্যঞ্জনাগম : শব্দের মধ্যে যুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে, এমনকি না থাকলেও অনেক সময় একটি ব্যঞ্জনের আগম ঘটে। একে মধ্য ব্যঞ্জনাগম বলা যায়। যেমন : অম্ল > অম্বল, সুনর > সুন্দর, বানর > বান্দর, পোড়ামুখি > পোড়ারমুখি ইত্যাদি।

য়-শ্রুতি : দুটি স্বরধ্বনি পাশাপাশি থাকলে উচ্চারণের আড়ষ্টতা কাটাতে অনেক সময় একটি 'য়' ধ্বনির আগম ঘটে। একে য়-শ্রুতি বলে। যেমন : দু'এক > দুয়েক, ছাআ > ছায়া, বাবুআনি > বাবুয়ানি, গোআলা > গোয়ালা ইত্যাদি।

ব-শ্রুতি : দুটি স্বরধ্বনি পরস্পর সন্নিহিত থাকলে উচ্চারণের সুবিধার্থে অনেকসময় একটি অন্তঃস্থ-ব ধ্বনির আগম ঘটে থাকে। একে বলা হয় ব-শ্রুতি। যেমন : খাআ > খাবা, শোআ > শোবা (শোওয়া), ধোআ > ধোবা (ধোওয়া) ইত্যাদি।

৩. অন্ত্য-ব্যঞ্জনাগম : শব্দের অন্তে যুক্তব্যঞ্জন থাকলে কিংবা না থাকলেও অনেক সময় একটি ব্যঞ্জনধ্বনির আবির্ভাব ঘটে। একে অন্ত্য-ব্যঞ্জনাগম বলা চলে। যেমন : বহু > বহুল, ধনু > ধনুক, নানা > নানান, সীমা > সীমানা, বটু > বটুক, জমি > জমিন, ফাট > ফাটল ইত্যাদি।

ধ্বনিলোপ

উচ্চারণের ক্ষেত্রে অনেক সময় শব্দের অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ কোনও ধ্বনির উপর বেশি জোর পড়ে। এর ফলে অন্য একটি ধ্বনি লুপ্ত হয়। এই প্রক্রিয়াকেই বলা হয় ধ্বনি-লোপ। ধ্বন্যাগমের মতো ধ্বনি-লোপও মূলত দু-প্রকার : স্বরধ্বনিলোপ ও ব্যঞ্জনধ্বনিলোপ।

• **স্বরলোপ :** শব্দের অন্তর্গত কোনও স্বরধ্বনি লুপ্ত হওয়ার প্রক্রিয়াকেই বলা হয় স্বরলোপ। লুপ্ত স্বরধ্বনিটির স্থানানুসারে স্বরলোপ তিন প্রকার, যথাক্রমে, আদি-স্বরলোপ, মধ্য-স্বরলোপ এবং অন্ত্য-স্বরলোপ।

১. আদি-স্বরলোপ : শব্দের আদিতে অবস্থিত স্বরধ্বনিটি লুপ্ত হলে তাকে আদি-স্বরলোপ বলা হয়। যেমন : অলাবু > অলাউ > লাউ, উদ্ধার > উধার > ধার, উডুম্বর > ডুমুর, অভ্যন্তর > ভিতর, অতসী > তিসি ইত্যাদি।

২. মধ্য-স্বরলোপ : শব্দের মধ্যস্থিত স্বরধ্বনির লোপ পাওয়ার প্রক্রিয়ার নাম মধ্য-স্বরলোপ বা সম্প্রকর্ষ। এইভাবে শব্দের সৌকর্য তথা উৎকর্ষ সম্যকভাবে ও প্রকৃষ্টরূপে বাড়ানো সম্ভব বলে 'সম্প্রকর্ষ' নাম দেওয়া হয়েছে। বিপ্রকর্ষের বিপরীত প্রক্রিয়া এটি। যেমন : জানালা > জানলা, বসতি > বস্তি, ভগিনী > ভগ্নী, নাতিনী > নাতনি, নারিকেল > নারকেল ইত্যাদি।

৩. অন্ত্য-স্বরলোপ : শব্দের শেষে থাকা স্বরধ্বনির লোপকেই বলা হয় অন্ত্য-স্বরলোপ। বাংলা ভাষায় শব্দের অন্ত্য-অ প্রায়শই লোপ পায়। বস্তুত, বাংলাভাষার অন্যতম বিশিষ্ট ধ্বনিতাত্ত্বিক লক্ষণের মধ্যেই এটি পড়ে। আমরা লিখি 'জীবন', বলি 'জীবন্'। লিখি 'নর', বলার সময় হয়ে যায় 'নর্'। ভাষার বিবর্তনের ক্ষেত্রেও এই প্রক্রিয়াটি যে ক্রিয়াশীল তা দেখানো যায়। যেমন : হস্ত > হত্ত > হাত্, ভক্ত > ভত্ত > ভাত্ ইত্যাদি।

অন্ত্য-অ ছাড়া অন্য স্বরধ্বনির ক্ষেত্রেও লুপ্ত হওয়ার ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। যেমন : রাত্রি > রাতি > রাত্, খানি > খান্ ইত্যাদি। এছাড়া, বাংলা সন্ধির ক্ষেত্রে অনেক সময় স্বরলোপ ঘটে। যেমন : কাঁচা + কলা = কাঁচকলা , মিশি + কালো = মিশকালো।

● **ব্যঞ্জনলোপ :** পদের আদি-মধ্য বা অন্তে অবস্থিত স্বরধ্বনিযুক্ত বা স্বরধ্বনিবিহীন কোনো ব্যঞ্জনধ্বনির লোপ পাওয়ার প্রক্রিয়াকে বলা হয় ব্যঞ্জনলোপ। স্বরধ্বনির লোপের মতোই ব্যঞ্জনধ্বনিলোপকেও তিনটি প্রকারে বিভাজন করা সম্ভব, যথাক্রমে : আদি-ব্যঞ্জনলোপ, মধ্য-ব্যঞ্জনলোপ এবং অন্ত্য-ব্যঞ্জনলোপ।

১. **আদি-ব্যঞ্জনলোপ :** শব্দের আদিতে থাকা ব্যঞ্জনধ্বনির লোপ পাওয়ার পদ্ধতিকে বলা হয় আদি-ব্যঞ্জনলোপ। যেমন : স্থান > থান, স্ফটিক > ফটিক, বুই > উই, স্পর্শ > পরশ ইত্যাদি।

২. **মধ্য-ব্যঞ্জনলোপ :** শব্দের মধ্যস্থিত ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পাওয়ার ঘটনাকে মধ্য-ব্যঞ্জনলোপ বলা হয়। যেমন : ফাল্গুন > ফাগুন, গোষ্ঠ > গোঠ, অশ্বত্থ > অশথ, কার্পাস > কাপাস, কর্ম > কম্ম, শৃগাল > শিয়াল, বেহাই > বেয়াই ইত্যাদি।

৩. **অন্ত্য-ব্যঞ্জনলোপ :** শব্দের শেষে থাকা ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে তাকে অন্ত্য-ব্যঞ্জনলোপ বলা যায়। যেমন : গাত্র > গা, বড়দাদা > বড়দা, মেজদিদি > মেজদি, ছোটোদাদা > ছোড়দা, বউদিদি > বউদি, গাহে > গায় ইত্যাদি। বাংলার সন্ধির সময় অনেকক্ষেত্রে ব্যঞ্জনলোপও ঘটে। যেমন : জগৎ + জন = জগজন, জগৎ + বন্ধু = জগবন্ধু ইত্যাদি।

ধ্বনির রূপান্তর

ধ্বনির আগম ও লোপ ছাড়া ধ্বনি পরিবর্তনের তৃতীয় এবং অন্যতম প্রধান কারণ ধ্বনির রূপান্তর। শব্দের অন্তর্গত বিভিন্ন ধ্বনির একের অপরের প্রভাবে রূপান্তর অথবা পরস্পরের প্রভাবে ধ্বনির রূপান্তরের বিভিন্ন ধারার মধ্যে প্রধান পাঁচটি ধারা হলো—

- অপিনিহিতি
- অভিশ্রুতি
- স্বর-সংগতি
- ব্যঞ্জন সংগতি বা সমীভবন
- ধ্বনি-বিপর্যয় বা বিপর্যাস

● **অপিনিহিতি :** শব্দের মধ্যে ‘ই’ বা ‘উ’ ধ্বনি থাকলে অনেক সময় তাদের যথানির্দিষ্ট উচ্চারণ স্থানের ঠিক আগে উচ্চারিত হওয়ার একটি বিশেষ প্রবণতা দেখা যায়। এই রীতিকে ‘অপিনিহিতি’ বলা হয়। অপিনিহিতি-নামটির মধ্যেই প্রক্রিয়াটির ইঙ্গিত রয়েছে। ‘অপি’ উপসর্গটির অর্থ ‘আগে’ বা ‘পূর্বে’, আর ‘নিহিতি’ শব্দের অর্থ সন্নিবেশ বা নিয়ে আসা। অপিনিহিতি বলতে তাই বোঝায়, ‘ই’ বা ‘উ’ ধ্বনির যথাবিহিত অবস্থানের পূর্বে অবস্থান। যেমন, (করিয়া = ক + অ + র্ + ‘ই’ + য্ + আ > ক + অ + ‘ই’ + র্ + য্ + আ + কইর‍্যা) উদাহরণটিতে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, ‘ই’ ধ্বনিটি ‘র্’-এর পরে উচ্চারিত না হয়ে টপকে ‘র’-এর আগে চলে এসেছে। একই রকমে হয়, চলিয়া > চইল্যা, বলিয়া > বইল্যা।

ই-কারের অপিনিহিতি : রাতি > রাইত, আজি > আইজ, কালি > কাইল, চারি > চাইর, ভাবিয়া > ভাইব্যা, বাদিয়া > বাইদ্যা ইত্যাদি।

উ-কারের অপিনিহিতি : চক্ষু > চউখ, সাধু > সাউধ, জলুয়া > জউলুয়া, মাছুয়া > মাউছুয়া, নাটুয়া > নাউটুয়া ইত্যাদি।

য [ই + অ] -ফলার অন্তর্গত ই-কারের অপিনিহিতি: তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে, স্বরসন্ধিতে ই + অ = য(্য) হয়, তাই শব্দে য-ফলা থাকলে সেখানেও অপিনিহিতি সম্ভব। যেমন : কন্যা > কইন্যা

[ক + অ + ন্ + 'ই' + আ > ক + অ + 'ই' + ন্ + ই + আ)

একই রকমে, কাব্য > কাইব্য, সত্য > সইত্য, পথ্য > পইথ্য ইত্যাদি।

ক্ষ ও জ্ঞ থাকলে অপিনিহিতি : বাংলা ভাষায় 'ক্ষ'-র উচ্চারণ 'খিয়' আর 'জ্ঞ'-র উচ্চারণ অনেকটা যেন 'গ্যঁ'। এর কারণে শব্দে 'ক্ষ' বা 'জ্ঞ' থাকলে অপিনিহিতি সংঘটিত হয়ে থাকে। যেমন : লক্ষ > লইকখ, যক্ষ > যইকখ, যজ্ঞ > যইগগোঁ ইত্যাদি।

● **অভিশ্রুতি :** অপিনিহিতির পরের স্তরটি হলো অভিশ্রুতি। অপিনিহিতির কারণে পূর্বে উচ্চারিত 'ই' বা 'উ' সন্নিহিত স্বরধ্বনিগুলিকে প্রভাবিত করে এবং নিজেরাও প্রভাবিত হয়ে চলিত বাংলায় ধ্বনির যে পরিবর্তন ঘটায় তাকে অভিশ্রুতি বলে।

অভিশ্রুতির প্রক্রিয়াটি কীভাবে সংঘটিত হয়, দেখা যাক :

আমরা আগেই জেনেছি যে, ভাষার বিবর্তনে অপিনিহিতি হলো অভিশ্রুতির পূর্ববর্তী স্তর।

অর্থাৎ, করিয়া > কইর‍্যা > করে

[ক + অ + র্ + ই + য্ + আ] > [ক + অ + ই + র্ + য্ + আ] > [ক্ + অ + র্ + এ]

(অপিনিহিতি) > (অভিশ্রুতি)

এখানে দ্রষ্টব্য যে, আগে চলে আসা 'ই' ধ্বনিটি আশপাশের ধ্বনিগুলির প্রভাবে এবং নিজেও তাদের প্রভাবে কীভাবে বদলে যাচ্ছে। অভিশ্রুতি সচরাচর 'অ' এবং 'আ' ধ্বনির সঙ্গে 'ই' ও 'উ' ধ্বনির মিলনে ঘটে। এর কতগুলি প্রকারভেদ হতে পারে :

[অ + ই > ও] : বলিয়া > বইল্যা > বলে, ধরিয়া > ধইর‍্যা > ধরে, চলিতে > চইলতে > চলতে, করিতে > কইরতে > করতে ইত্যাদি।

[আ + ই > আ, এ] : আজি > আইজ > আজ, গাঁঠি > গাঁইট > গাঁট, ভাবিয়া > ভাইব্যা > ভেবে, বাদিয়া > বাইদ্যা > বেদে ইত্যাদি।

[অ + উ > ও] : জলুয়া > জউলুয়া > জোলো, চক্ষু > চউখ > চোখ, পটুয়া > পোটো ইত্যাদি।

[আ + উ > এ] : ভাতুয়া > ভাউতুয়া > ভেতো, মাঠুয়া > মাউঠুয়া > মেঠো, মাছুয়া > মাউছুয়া > মেছো, নাটুয়া > নাউটুয়া > নেটো (লেটো) ইত্যাদি।

● **স্বরসংগতি :** শব্দের মধ্যে একাধিক স্বরধ্বনি থাকলে উচ্চারণের সময় তারা পরস্পরকে প্রভাবিত করে একটি সংগতিসাধন করে। অর্থাৎ, বিষম স্বর থাকলে তাকে সমস্বরে পালটে ফেলে শব্দের অন্তর্গত স্বরধ্বনিগুলির মধ্যে সঙ্গতিসাধনের এই প্রবণতাকেই বলা হয় স্বরসংগতি। এই নামটি আচার্য সুনীতিকুমার-প্রস্তাবিত।

তোমাদের জানা আছে যে, স্বরধ্বনিগুলিকে উচ্চারণস্থান-অনুযায়ী উচ্চ-মধ্য-নিম্ন কিংবা সম্মুখস্থ-পশ্চাৎভাগস্থ এবং উচ্চারণের ধরন অনুযায়ী প্রসারিত-কুঞ্চিত অথবা সংবৃত-বিবৃত প্রভৃতি প্রকারে শ্রেণিভুক্ত করা যায়। এও তোমরা জানো যে, জিভ সবসময় চায় কাছাকাছি থাকা ধ্বনিগুলিকে উচ্চারণ করে পরিশ্রম কমাতে। এই কারণেই কোনও শব্দে যদি উচ্চারণের স্থান ও প্রকার-অনুযায়ী দূরের দুটি স্বর পাশাপাশি থাকে, জিভ তবে চেষ্টা করবে একটি স্বরকে উপেক্ষা করে অন্য স্বরটির সদৃশ বা কাছাকাছি স্বরধ্বনি দিয়ে উপেক্ষিত স্বরটিকে প্রতিস্থাপন করতে। যেমন, উনান > উনোন > উনুন। এই উদাহরণে 'উ' (উচ্চ, ওষ্ঠ্য, কুঞ্চিত, সংবৃত স্বরধ্বনি)-র পর 'আ' (নিম্ন, কণ্ঠ্য, বিবৃত) উচ্চারণ করতে জিভকে অনেক বেশি নড়াচড়া করতে হচ্ছিল। 'উনোন' বললে 'ও' (উচ্চ-মধ্য, কণ্ঠৌষ্ঠ্য, কুঞ্চিত,সংবৃত)-ধ্বনিটি 'উ'-এর অনেক কাছাকাছি থাকার কারণে জিভের পরিশ্রম অনেক বাঁচে। আর খাটনি সবচেয়ে কমানো যায় 'উনুন' বললে। এখানে পূর্ববর্তী স্বরটি নিজের প্রভাব খাটিয়ে পরবর্তী স্বরধ্বনিটিকে শুধু পালটেই ফেলেনি নিজের অনুরূপ ও অভিন্ন করে তুলেছে।

স্বরসংগতির দুটি প্রকারভেদ সম্ভব— ১.পূর্ববর্তী স্বরের প্রভাবে পরবর্তী স্বরের পরিবর্তন, ২. পরবর্তী স্বরের প্রভাবে পূর্ববর্তী স্বরের পরিবর্তন।

১. পূর্ববর্তী স্বরের প্রভাবে পরবর্তী স্বরের পরিবর্তন :

১. পূর্ববর্তী 'উ' ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী 'আ' ধ্বনি 'ও'-ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। যেমন : তুলা > তুলো, বুড়া > বুড়ো, ছুতার > ছুতোর, দুয়ার > দুয়োর ইত্যাদি।

২. পূর্ববর্তী 'ই' ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী 'আ'-ধ্বনি 'এ' -ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। যেমন : ভিক্ষা > ভিক্ষে, মিথ্যা > মিথ্যে, হিসাব > হিসেব, বিকাল > বিকেল ইত্যাদি।

৩. পূর্ববর্তী 'ই'-ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী 'আ'-ধ্বনি 'ই' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন : বিলাতি> বিলিতি, বিনা > বিনি, ভিখারি > ভিখিরি, বিকাকিনা > বিকিকিনি ইত্যাদি।

৪. পূর্ববর্তী 'উ'-ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী 'আ'-ধ্বনির 'উ'-ধ্বনিতে রূপান্তর ঘটে। যেমন : উনান > উনুন, ধুনাচি > ধুনুচি, কুড়াল > কুড়ুল, উড়ানি > উড়ুনি ইত্যাদি।

৫. পূর্ববর্তী 'ঔ' (ও + উ)-ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী 'আ'-ধ্বনির 'ও'-ধ্বনিতে পরিবর্তন ঘটে। যেমন : নৌকা > নৌকো, চৌকা > চৌকো ইত্যাদি।

২. পূর্ববর্তী স্বরের প্রভাবে পূর্ববর্তী স্বরের পরিবর্তন :

১. পরবর্তী 'আ'-ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী 'উ'-ধ্বনি 'ও'-ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। যেমন : উড়া > ওড়া, মুলা > মোলা, শুনা > শোনা, বুঝা > বোঝা ইত্যাদি।

২. পরবর্তী 'আ'-ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী 'ই' ধ্বনি 'এ'-ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন : লিখা > লেখা, মিলা >মেলা, শিয়াল > শেয়াল, পিয়ালা > পেয়ালা ইত্যাদি।

৩. পরবর্তী ‘ই’ ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ‘এ’-ধ্বনির ‘ই’-ধ্বনিতে রূপান্তর ঘটে। যেমন : দেশি > দিশি, বেটি > বিটি ইত্যাদি।

৪. পরবর্তী ‘ই’ ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ‘আ’-ধ্বনিরও ‘ই’ ধ্বনিতে রূপান্তর ঘটে। যেমন : সন্ন্যাসী > সন্নিসি।

৫. পরবর্তী ‘ই’ বা ‘উ’-ধ্বনির কারণে পূর্ববর্তী ‘অ’-ধ্বনির পরিবর্তে ‘ও’ ধ্বনি উচ্চারিত হয়। বস্তুত, বাংলা ভাষার এটি একটি বিশিষ্ট চরিত্র লক্ষণ। যেমন :

কবি > কোবি, মন > মোন, অপু > ওপু, মধু > মোধু ইত্যাদি।

৬. পরে ‘ক’, ‘খ’, ‘ঙ’, ‘চ’ বা ‘ল’-ধ্বনি থাকলে এক অক্ষর (Syllable) -বিশিষ্ট শব্দের আদিতে থাকা ‘এ’-ধ্বনিটি অনেক সময় ‘অ্যা’-ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন : এক > অ্যাক দ্বি-অক্ষরবিশিষ্ট শব্দের ক্ষেত্রেও ‘ক’ , ‘খ’, ‘ঙ’, ‘চ’ বা ‘ল’ ধ্বনির সঙ্গে আ-কার যুক্ত থাকলে শব্দের আদিস্থিত ‘এ’-ধ্বনিটি পালটে ‘অ্যা’-ধ্বনি হয়ে যায়। যেমন : একা > অ্যাকা, দেখা > দ্যাখা, ঢেঙা > ঢ্যাঙা, বেচা > ব্যাচা, মেলা > ম্যালা ইত্যাদি।

• **ব্যঞ্জন-সংগতি বা সমীভবন :** ভিন্ন ভিন্ন ব্যঞ্জনধ্বনি পদের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হলে উচ্চারণের সুবিধার জন্য একে অপরকে, অথবা উভয়েই পরস্পরকে প্রভাবিত ও রূপান্তরিত করে। একেই বলা হয় ব্যঞ্জন-সংগতি বা সমীভবন। পূর্ববর্তী ‘ধ্বনি পরবর্তী’ ধ্বনিকে রূপান্তরিত করলে তাকে বলে প্রগত সমীভবন। পরবর্তী ধ্বনি পূর্ববর্তী ধ্বনিকে পরিবর্তিত করলে তাকে বলে পরাগত সমীভবন। পরস্পরের প্রভাবে উভয়েরই রূপান্তর ঘটলে তাকে বলা হয় অন্যোন্য সমীভবন।

১. প্রগত ব্যঞ্জন-সংগতি বা সমীভবন : পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী অসম ব্যঞ্জনধ্বনিটি পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের আকার প্রাপ্ত হলে তাকে প্রগত সমীভবন বলা হয়। যেমন :

(পদ্ম = প + অ + দ + ম + অ > প + অ + দ + দ + অ = পদ্দ) এখানে লক্ষণীয়, পরবর্তী ‘ম’ ধ্বনি পূর্ববর্তী ‘দ’-ধ্বনির সদৃশ হয়ে যাচ্ছে। এই রকমে,

পক্ব > পক্ক, চন্দন > চন্নন, কুলিয়ে > কুললে।

২. পরাগত ব্যঞ্জন-সংগতি বা সমীভবন : পরবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ‘অসম ব্যঞ্জনধ্বনিটির পরবর্তী’ ব্যঞ্জনের রূপ ধারণকে বলা হয় পরাগত সমীভবন। যেমন, (কর্ম = ক + অ + ‘র’ + ম + অ > ক + অ + ‘ম’ + ম + অ = কম্ম) লক্ষণীয়, এখানে পূর্ববর্তী ‘র’ ধ্বনি পরবর্তী ‘ম’-ধ্বনিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। একই রকমে, কর্তা > কত্তা, রাঁধনা > রান্না, কর্পূর > কপপূর, যতদূর > যদ্দূর ইত্যাদি।

৩. অন্যোন্য ব্যঞ্জন-সংগতি বা সমীভবন : পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দুটি অসম ব্যঞ্জনধ্বনি পরস্পরকে প্রভাবিত করে রূপান্তরিত হলে তাকে অন্যোন্য সমীভবন বলা হয়ে থাকে। যেমন, উৎশ্বাস > উচ্ছ্বাস, মহোৎসব > মোচ্ছব, তৎহিত > তদ্ধিত, চারটি > চাড্ডি, বৎসর > বচ্ছর ইত্যাদি।

● **ধ্বনি-বিপর্যয় :** উচ্চারণকালে বিপর্যয়জনিত কারণে শব্দের মধ্যবর্তী ধ্বনিগুলির স্থান পরিবর্তিত হলে তাকে ধ্বনি-বিপর্যয়, স্থিতি-পরিবৃত্তি বা বিপর্যাস নামে ডাকা হয়। অর্থাৎ, এককথায় বলা যায় যে, উচ্চারণের ভুলে ধ্বনির স্থান অদল-বদল হয়ে যাওয়াকেই ধ্বনি-বিপর্যয় বলা চলে। যেমন : হ্রদ > হদ > দহ, রিকশা > রিশকা, আলনা > আনলা, মুকুট > মুটুক, তলোয়ার > তরোয়াল ইত্যাদি।

---

১. **ঠিক বিকল্পটি বেছে নিয়ে বাক্যটি আবার লেখো :**

১.১ যুক্তি > যুকতি হলো —

(ক) স্বরভক্তির উদাহরণ (খ) মধ্য স্বরাগমের উদাহরণ

(গ) স্বরসংগতির উদাহরণ (ঘ) অপিনিহিতির উদাহরণ।

১.২ ইঞ্চ > ইঞ্চি — এক্ষেত্রে ঘটেছে —

(ক) মধ্যস্বরলোপ (খ) স্বরসংগতি (গ) অন্ত্যস্বরলোপ

(ঘ) অন্ত্যস্বরাগম।

১.৩ জানালা থেকে জানলা হয়েছে —

(ক) অভিশ্রুতির কারণে (খ) প্রগত সমীভবনের কারণে

(গ) অন্যোন্য সমীভবনের কারণে (ঘ) মধ্যস্বরলোপের কারণে।

১.৪ পূর্ববর্তী স্বরের প্রভাবে পরবর্তী স্বর পরিবর্তিত হলে তাকে বলা হয় —

(ক) মধ্যগত স্বরসংগতি (খ) অভিশ্রুতি (গ) প্রগত স্বরসংগতি

(ঘ) সমীকরণ।

১.৫ ধোঁকা > ধুঁকো হলো। এক্ষেত্রে ঘটেছে —

(ক) অন্যোন্য সমীভবন (খ) অন্যোন্য স্বরসংগতি

(গ) অপিনিহিতি (ঘ) মধ্যস্বরাগম।

১.৬ শব্দের মধ্যে ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত ‘ই’ কার বা ‘উ’ কারকে সেই ব্যঞ্জনধ্বনির আগেই উচ্চারণ করার রীতিটি হলো —

(ক) অভিশ্রুতি (খ) ব্যঞ্জনসংগতি (গ) অপিনিহিতি (ঘ) বিপর্যাস।

১.৭ রাখিয়া > রাইখ্যা > রেখে। এক্ষেত্রে ঘটেছে —

(ক) ধ্বনিবিপর্যয় (খ) মধ্যস্বরলোপ (গ) অন্ত্যস্বরলোপ (ঘ) অভিশ্রুতি

১.৮ সমাক্ষরলোপের একটি দৃষ্টান্ত হলো —

(ক) ফলাহার > ফলার (খ) বড়দিদি > বড়দি (গ) পোষ্য > পুষ্যি (ঘ) দেশি > দিশি

১.৯ গাত্র > গা। এটি —

(ক) অন্তব্যঞ্জনলোপের উদাহরণ

(খ) মধ্যগত স্বরসংগতির উদাহরণ

(গ) অন্যোন্য স্বরসংগতির উদাহরণ

(ঘ) সমাক্ষরলোপের উদাহরণ।

১.১০ একাধিক ধ্বনি পরিবর্তন প্রক্রিয়ার যোগফল হলো —

(ক) য়-শ্রুতি (খ) অপিনিহিতি (গ) অভিশ্রুতি (ঘ) ব-শ্রুতি

২. **নির্দেশ অনুযায়ী নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :**

২.১ ধ্বনি পরিবর্তনের মূল কারণগুলি উল্লেখ করো।

২.২ ‘স্বরাগম’ বলতে কী বোঝ?

২.৩ মধ্যস্বরাগমের একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করো।

২.৪ শব্দের শুরুতে ব্যঞ্জনাগম ঘটেছে এমন একটি উদাহরণ দাও।

২.৫ ব-শ্রুতি ঘটার কারণ কী?

২.৬ ভক্ত > ভত্ত— এক্ষেত্রে ধ্বনি পরিবর্তনের কোন নিয়মটি লক্ষ করা যায়?

২.৭ অভিশ্রুতিকে অপিনিহিতির পরবর্তী স্তর বলা হয় কেন?

২.৮ সমীভবনকে ব্যঞ্জনসংগতি বলার কারণ কী?

২.৯ ‘ক্ষ’ ও ‘জ্ঞ’ এই দুই ক্ষেত্রে কীভাবে অপিনিহিতি লক্ষ করা যায়?

২.১০ ধ্বনিবিপর্যয় বলতে কী বোঝ?

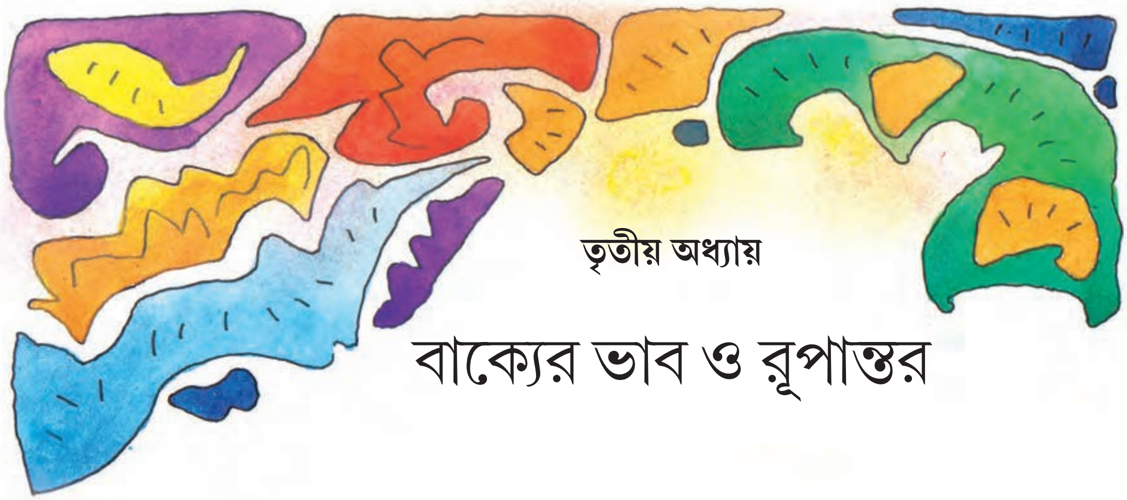

তৃতীয় অধ্যায়

বাক্যের ভাব ও রূপান্তর

ভাষা ভাবের বাহন। অর্থাৎ আমাদের মনের বিভিন্ন ভাবের প্রকাশ এবং আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যেই আবিষ্কার হয়েছে ভাষার। ষষ্ঠ শ্রেণিতে তোমরা জেনেছ, গঠন-অনুযায়ী বাক্যকে কীভাবে সরল, যৌগিক ও জটিল — এই তিন শ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত করা যায়। এই বিভাজন সম্পূর্ণ গঠন-নির্ভর এবং বাক্যে বিভিন্ন পদের অন্বয় ও একাধিক খণ্ডবাক্য/আশ্রয় বাক্যের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির মুখাপেক্ষী। বাক্যের আলোচনায় এর গঠনের মতোই অন্য একটি প্রসঙ্গও কিন্তু নিতান্ত আবশ্যিক। তা হলো এর অর্থ বা ভাবের বিষয়। উক্ত বাক্যের বক্তব্য বিষয় বা ঘটনাটির প্রতি বক্তা-মানুষটির মনোভাবের কথাই এখানে বুঝতে হবে। আর এই ভাব (ইংরাজিতে যাকে বলা হয় Mood) -বিষয়ক আলোচনাকে ব্যাকরণে খুবই গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়। কারণ, বাস্তব পরিস্থিতিতে ভাব আদানপ্রদানের সূত্রে আমরা যে বাক্যগুলি ব্যবহার করে থাকি, তার সঙ্গে অবধারিতভাবে যুক্ত থাকে চোখ, মুখ, মাথা, হাত, কাঁধ প্রভৃতি অঙ্গের সঞ্চালন ও বিভিন্ন ভঙ্গি এবং নানা-ধরনের স্বরপ্রক্ষেপণ। মাথা নেড়ে ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ বোঝানো, হাত নেড়ে কাছে আসতে বলার এই ভঙ্গিগুলিকে বলা হয় Para-language বা প্রায়-ভাষা। বাস্তব জীবনে এদের ব্যবহার সমধিক। একই বাক্য বিভিন্ন স্বরভঙ্গিতে বলে, দ্রুত কিংবা ধীরভাবে, ফিসফিস করে অথবা গর্জন করে বলে বিভিন্ন ও বিচিত্র ভাবের উদ্দীপন করা সম্ভব। এই বলার ধরনটি থেকেই উক্ত বাক্যে বর্ণিত বিষয় বা ঘটনাটির প্রতি বক্তার মনোভাবের হদিশ পাওয়া সম্ভব। তোমাদের মনে পড়তে পারে সপ্তম শ্রেণিতে পাঠ্য ‘পটলবাবু ফিল্মস্টার’-গল্পটির কথা; মাত্র একটি শব্দের সংলাপ বলার সুযোগ পেয়ে প্রাথমিক ভাবে হতাশ পটলবাবু কীভাবে ওই একটি শব্দের অসীম সম্ভাবনা আবিষ্কার করেছিলেন—

‘ আঃ, আঃ, আঃ, আঃ, আঃ— পটলবাবু বারবার নানান সুরে কথাটাকে আওড়াতে লাগলেন। আওড়াতে আওড়াতে ক্রমে তিনি একটি আশ্চর্য জিনিস আবিষ্কার করলেন। ওই আঃ কথাটাই নানান সুরে নানান ভাবে বললে মানুষের মনের নানান অবস্থা প্রকাশ করছে, চিমটি খেলে মানুষে যেভাবে আঃ বলে, গরমে ঠান্ডা শরবত খেয়ে মোটেই সেভাবে আঃ বলে না। এ দুটো আঃ একেবারে আলাদা রকমের; আবার আচমকা কানে সুড়সুড়ি খেলে বেরোয় আরও আরেকরকম আঃ। এছাড়া

আরও কতরকম আঃ রয়েছে — দীর্ঘকালের আঃ, তাচ্ছিল্যের আঃ, অভিমানের আঃ, ছোটো করে বলা আঃ, লম্বা করে বলা আঃ-, চেঁচিয়ে বলা আঃ, মৃদুস্বরে আঃ, চড়াগলায় আঃ, খাদে গলায় আঃ, আবার 'আ-টাকে খাদে শুরু করে বিসর্গটায় সুর চড়িয়ে আঃ—আশ্চর্য! পটলবাবুর মনে হলো তিনি যেন ওই একটি কথা নিয়ে একটা আস্ত অভিধান লিখে ফেলতে পারেন।'

যে কোনো কথিত বাক্যের ক্ষেত্রেই এই কথা সত্য। লিখিত বা মুদ্রিত-রূপে বাক্যের এই ভাবের দিকটি প্রকাশ করা বেশ কঠিন। উদ্ধৃতি চিহ্নের সার্থক ব্যবহার এবং বক্তার মনোভাবের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়া লেখক এক্ষেত্রে বস্তুত নিরুপায়। ফলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কথোপকথনের প্রসঙ্গ সূত্রে অনুমানের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া পাঠকেরও অন্য রাস্তা খোলা থাকে না। ষষ্ঠ শ্রেণিতে তোমরা বাক্যের গঠনগত আলোচনার সূত্রেই অস্ত্যর্থক (অস্তি+অর্থক) বা হ্যাঁ-বাচক বাক্য এবং নঞর্থক বা না-বাচক বাক্য সম্বন্ধে জেনেছিলে। বাক্যের ভাব বা অর্থ-ভিত্তিক প্রকার ভেদের আলোচনাতেও এই দুইপ্রকার বাক্য নিয়ে কিন্তু কথা বলা জরুরি।

বাক্যের অর্থভিত্তিক প্রকারভেদ

● **অস্ত্যর্থক বাক্য ও নঞর্থক বাক্য :** অস্ত্যর্থক বাক্য বা হ্যাঁ-বাচক বাক্যে গঠন যেমন অস্ত্যর্থক বা সদর্থক হয়, তেমনই অর্থের দিক থেকেও এই প্রকার বাক্যে একটি স্বীকৃতির ভাব থাকে।

অপর দিকে নঞর্থক বাক্যে নঞর্থক গঠনের সঙ্গে অর্থগতভাবে কোনও কিছু অস্বীকৃতির ব্যঞ্জনা কাজ করে। বাংলা ভাষায় বাক্যকে নেতিবাচক করার ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা নেয় দুটি শব্দ— 'না' এবং 'নয়'।

না-শব্দটির ব্যবহার অনেকটা ক্রিয়াবিশেষণের মতো। 'যাব না', 'খাব না' প্রভৃতি উদাহরণে দেখা যাবে 'না' যেন তার সঙ্গে যুক্ত ক্রিয়াটির দোষ-গুণ বিশ্লেষণ করছে।

না-শব্দ সাধারণত অসমাপিকা ক্রিয়ার আগে এবং সমাপিকা ক্রিয়ার পরে বসে। যেমন - '<u>না</u> জানিয়ে যেও না।' অবশ্য মনে রাখা দরকার, প্রাচীন বাংলাতে এই 'না' সমাপিকা ক্রিয়ার আগেই বসত। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'- নামের আদি-মধ্যযুগের একটি বাংলা বইয়ে দেখব এইরকম বাক্য— 'সো এহি পথে মহাদানী না বলয়ো।' নঞর্থক বাক্যে সমাপিকা ক্রিয়ার পরে 'না'-বসা বাংলা ভাষার বিশিষ্ট বিবর্তনের ফল।

না-শব্দের অতীতকালবোধক রূপ হলো 'নি'; যেমন, যাইনি, খাওনি, বলেনি প্রভৃতি। অতীতকালে না > নি

যে-সব প্রশ্নের উত্তর কেবল হ্যাঁ/না হয় সেইসব ক্ষেত্রে অতীতকাল হলেও নেতিবাচক প্রশ্নটিতে 'না'-শব্দই ব্যবহৃত হয়, 'নি' নয়। যেমন, 'বিদ্যাসাগরও কি ছোটোবেলায় দুষ্টু ছিলেন <u>না</u>?'

নয়-শব্দটির ব্যবহার একটু ভিন্নরকম। 'নয়' মূলত নামপদের পরে বসে; যেমন, 'এ তোমার কাজ নয়।'

অনেকসময় 'এমন নয়', 'তা নয়' প্রভৃতি গঠন তৈরি করে বাক্যকে জটিলরূপ দেওয়া হয়। যেমন,

'এমন নয় যে আমি পড়তে খুব ভালোবাসি।'

বা

'মনে ভাবনা ছিল না তা নয়।'

দ্বিতীয় উদাহরণটিতে দেখব, দু'প্রকার না-বাচক শব্দ ব্যবহার করায় সম্পূর্ণ বাক্যটির অর্থ কিন্তু অস্ত্যর্থক, অর্থাৎ হ্যাঁ-বাচক হয়ে গেছে।

● **নির্দেশক বা বিবৃতিমূলক বাক্য :** এই ধরনের বাক্যে কোনো ঘটনা বা ভাবের বিবৃতি থাকে। কোনো ভাব বা ঘটনার বিবরণের অতিরিক্ত বিশেষ কোনো মনোভঙ্গি প্রকাশ না পেলেও এই ধরনের বাক্যে বক্তার নিশ্চয়তার বোধটি বিশেষ ভাবে নজর কাড়ে। যেমন,

'ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বীজ পাকিয়া থাকে।'

'তাঁর একলার অমতে কিছু আসে যায় না।'

উপরের উদাহরণ থেকেই স্পষ্ট যে, বিবৃতিমূলক বাক্য অস্ত্যর্থক ও নঞর্থক দুই-ই হতে পারে। যে বাক্যে কোনো ঘটনা বা ভাব বিবৃতির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাকে সদর্থক বা অস্ত্যর্থক নির্দেশক বাক্য বলা হয়। যেমন,

'টেনিদা নড়ে-চড়ে বসল।'

আর, যে বাক্যে কোনো ঘটনা বা ভাবের অস্তিত্ব বিবৃতির মাধ্যমে অস্বীকৃত হয়, তাকে নঞর্থক বিবৃতিমূলক বাক্য বলা হয়। যেমন,

'আমি এখানে সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে আসি নাই।'

● **প্রশ্নবোধক বাক্য :** এই বাক্যগুলি বক্তার প্রশ্নসূচক প্রকাশের নিদর্শন। এই ধরনের বাক্যে কোনো ভাব, বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে কোনো একটি জিজ্ঞাসার ভাব প্রধান হয়ে ওঠে। যেমন,

'তোমরা কেউ খুশ-হাল খাঁ খট্টকের গজল জানো?'

'দরজা খুলছিল না কেন?'

অর্থাৎ, প্রশ্নবোধক বাক্যও অস্ত্যর্থক ও নঞর্থক দুই-ই হতে পারে। তবে এই নিয়ে আরও বিস্তারিত ভাবে আলোচনার অবকাশ আছে।

প্রশ্নসূচক প্রকাশের দুটি বিশিষ্ট ধরন আছে: ১. 'ক' প্রশ্ন বা Wh. Questions এবং ২. হ্যাঁ/না - প্রশ্ন

১. ক-প্রশ্ন বা Wh-Questions এর মধ্যে পড়বে কী, কেন, কীভাবে, কারা, কোথায়, কখন, কবে, কেমন করে প্রভৃতি অব্যয়, ক্রিয়াবিশেষণ, সর্বনাম বা বিশেষণ-সহযোগে প্রশ্ন তৈরির কৌশল। বাংলার যেমন এই প্রশ্নবাচক উপাদানগুলি 'ক' দিয়ে শুরু, ইংরাজিতে when, where, what, which,

whom প্রভৃতি প্রশ্নসূচক উপাদানগুলি 'Wh' দিয়ে শুরু হয়। এই কারণেই এদের মাধ্যমে তৈরি প্রশ্নগুলিকে ক-প্রশ্ন বা Wh-Question বলা হয়ে থাকে।

যেমন, ‘কোথায় গেছিলে?’
‘বেগুন ছাড়া আর কী খাও না?’
‘ক-খানা বই রে?’

এইসব ক্ষেত্রে প্রশ্নবাক্যের গঠন অস্ত্যর্থক হলে তার অর্থও অস্ত্যর্থক হয়। আর গঠন নঞর্থক হলে অর্থও নঞর্থক হয়ে যায়। উপরের উদাহরণে যেমন প্রথম আর তৃতীয় প্রশ্নবাক্যটি অস্ত্যর্থক, দ্বিতীয় বাক্যটি নঞর্থক।

২. **হ্যাঁ/না-প্রশ্ন :** এই জাতীয় প্রশ্নের বৈশিষ্ট্য এই যে, এর উত্তর সর্বদাই হ্যাঁ অথবা না হয়। যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, কী খাবে? তখন এই প্রশ্নের উত্তর হতে পারে অজস্র, অসংখ্য।

কিন্তু যদি প্রশ্ন করি, খাবে কি?

তখন উত্তর হতে পারে কেবল হ্যাঁ অথবা না।

লক্ষণীয়, প্রথম উদাহরণটি ক-প্রশ্নের নিদর্শন। এক্ষেত্রে প্রশ্নবাচক সর্বনাম ‘কী’ সবসময় ক্রিয়ার আগে বসে থাকে।

অপরদিকে, দ্বিতীয় উদাহরণে ‘কি’ অব্যয়টি বাক্যের শেষে বসে ক্রিয়া সম্বন্ধীয় প্রশ্ন তৈরি করেছে।

এই ধরনের প্রশ্নে গঠন অস্ত্যর্থক হলেই অর্থও সদর্থক হবে, এমন বলা যায় না। উল্টোটাও সত্যি, অর্থাৎ নঞর্থক গঠনের প্রশ্ন অর্থগত ভাবে অস্ত্যর্থক হতেই পারে। যেমন, ‘দেশের এই দুর্দিনে তুমি কি চুপ করে বসে থাকবে?’

উপরের প্রশ্নটির গঠন অস্ত্যর্থক হলেও নেতিবাচক উত্তরের প্রত্যাশা প্রশ্নটির মধ্যেই প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে।

আবার যদি বলি, ‘এই বিপদে তুমি কি নিজেকে জনসেবায় নিয়োজিত করবে না?’ তাহলেও দেখব প্রশ্নটির গঠন যতই নঞর্থক হোক, এর অন্তরে প্রবল সদর্থকতা বিদ্যমান রয়েছে।

প্রশ্নসূচক প্রকাশের অন্য ধরনগুলির মধ্যে পড়ে, যথাক্রমে—

৩. **লগ্নপ্রশ্ন :** কথ্য বিষয়ে সমর্থন আদায়ের জন্য যে লেজুড় প্রশ্ন ব্যবহার করা হয় তাকেই লগ্ন প্রশ্ন বলা হয়। যেমন,

‘তুমি যাবে, তাই তো?’

কেমন, না, তাই না, আচ্ছা, নাকি প্রভৃতি অব্যয় যোগে এই ধরনের প্রশ্ন তৈরি হয়ে থাকে।

৪. **সামাজিক আলাপচারিতার প্রশ্ন :** এর মূল লক্ষ্য সৌজন্যপ্রকাশ। ব্যাকরণ-সঙ্গত হলেও আসলে এগুলো ছদ্ম-প্রশ্ন, যেমন, ‘ভালো আছেন তো?’
‘কি, বাজারে চললেন?’ ইত্যাদি।

৫. **প্রতিস্পর্ধামূলক প্রশ্ন :** এই ধরনের প্রশ্নে বক্তার প্রতিস্পর্ধী ভাবটি ফুটে ওঠে, এই ক্ষেত্রেও গঠন ও অর্থের মধ্যে সংগতি না-ই থাকতে পারে। যেমন,

'আমি কি ডরিব সখি ভিখারি রাঘবে?'

'কই দেখি কী পড়েছ?'

উপরের দুটি উদাহরণেই দেখব গঠন অস্ত্যর্থক হলেও নেতিবাচক উত্তর এই স্পর্ধিত প্রকাশের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে।

● **বিস্ময়সূচক বাক্য :** এই ধরনের বাক্যে প্রকাশিত হয় মনের দুঃখ, আনন্দ প্রভৃতি আবেগ ও তজ্জনিত নানাবিধ উচ্ছ্বাস। যেমন,

'আঃ, কী আরাম!'

'আহা, কী দেখিলাম!'

'এই রইল তোদের পিকনিক—আমি চললাম!'

'আমি কিছুতেই যাব না!' ইত্যাদি।

বিস্ময়সূচক বাক্যও অস্ত্যর্থক ও নঞর্থক — উভয়ই হতে পারে।

● **অনুজ্ঞাবাচক বাক্য :** এই ধরনের বাক্যে প্রকাশ পায় আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, প্রার্থনা বা নিষেধ ইত্যাদির ভাব। এই ধরনের বাক্যে বক্তব্য বিষয়টির মধ্য দিয়ে বক্তার ইচ্ছা, নির্বাচন অথবা নৈতিক অবস্থানটি সূচিত হয়। বক্তার ইচ্ছার অনুরূপ বক্তব্যই জ্ঞাপিত হয় বলে এই ধরনের বাক্যের নাম অনুজ্ঞাবাচক বাক্য। অনুজ্ঞাবাচক বাক্যও গঠন ও ভাবের দিক থেকে অস্ত্যর্থক ও নঞর্থক হয়ে থাকে। যেমন,

'এগিয়ে চলো।'

'বৃথা সময় নষ্ট করো না'

'দেখিস, আমাদের ভুলিস নে।'

উপরের প্রথম তিনটি উদাহরণ থেকে দেখা যাবে, অনুজ্ঞাবাচক বাক্যে ক্রিয়াপদ মধ্যম পুরুষ বা তুমি-পক্ষের সাধারণ রূপে থাকলে, অর্থাৎ 'তুই' বা 'আপনি'-রূপে না থাকলে, ক্রিয়াটির সঙ্গে প্রায়ই 'ও'-কার যুক্ত হয়ে থাকে। যেমন—'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো'।

বাংলায় ভাব অনুযায়ী বাক্যের আরও কিছু প্রকারভেদ করা যায়। যেমন, ইচ্ছাবোধক বাক্য, শর্তসূচক বাক্য প্রভৃতি। এইগুলি নিয়ে পরবর্তী শ্রেণিতে আলোচনা করা যাবে। আপাতত একটি ছকের মাধ্যমে বাংলা বাক্যের ভাবগত প্রকৃতি-অনুসারে প্রধান আট প্রকারের বাক্যগুলিকে সাজিয়ে ফেলা যাক :

<table>
<tr><td></td><td>নির্দেশক/বিবৃতিমূলক</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">অস্ত্যর্থক</td><td>প্রশ্নবোধক</td><td rowspan="3">নঞর্থক</td></tr>
<tr><td>বিস্ময়সূচক</td></tr>
<tr><td>অনুজ্ঞাবাচক</td></tr>
</table>

অর্থের ভিত্তিতে বক্যের রূপান্তর-সাধন

- **সদর্থক/অস্ত্যর্থক বিবৃতিমূলক বাক্য থেকে নঞর্থক বিবৃতিমূলক বাক্য :**

১. রমা চুপ করিয়া রহিল। > রমা কথা কহিল না।/ রমা কিছু বলিল না।

২. চাটুজ্জেদের রোয়াকে বসে রোজ দু-বেলা আমরা গণ্ডায় গণ্ডায় হাতি গন্ডার সাবাড় করে থাকি। > চাটুজ্জেদের রোয়াকে বসে রোজ দু-বেলা আমরা গণ্ডায় গণ্ডায় হাতি-গণ্ডার সাবাড় যে করি না, এমন নয়।

৩. এরা সব 'ক্ষুদ্র শিল্পী'। > এরা কেউই খুব 'বড়ো শিল্পী' নয়।

৪. কদিন ধরে সমানে বৃষ্টি চলছে। > কদিন ধরে সমানে বৃষ্টির আব শেষ নেই।

৫. বেণীর মুখ গম্ভীর হইল। > বেণীর মুখ প্রফুল্ল রহিল না।

৬. ওখানেই জায়গা করে নেব। > ওখানেই জায়গা না-করে নিয়ে ছাড়ব না।

৭. তোমরা শুষ্ক গাছের ডাল সকলেই দেখিয়াছ। > তোমরা শুষ্ক গাছের ডাল কে না দেখিয়াছ?

৮. গত পনেরো বছর ধরে এই রেওয়াজ চলছিল। > গত পনেরো বছর ধরে এছাড়া অন্য রেওয়াজ ছিল না।

৯. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যখন রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে বঙ্গীয় শব্দকোষ রচনায় প্রবৃত্ত হন তখন বঙ্গীয় পণ্ডিত সমাজে তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন। > হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যখন রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে বঙ্গীয় শব্দকোষ রচনায় প্রবৃত্ত হন তখন বঙ্গীয় পণ্ডিত সমাজে তিনি একদমই পরিচিত ছিলেন না।

১০. লোকটার জেদ দেখে সুতা-মজুরের গলায়ও ফুটে উঠল সন্দেহ। > লোকটার জেদ দেখে সুতা-মজুরের গলায়ও সন্দেহ না-ফুটে উঠে পারল না।

- **নঞর্থক বিবৃতিমূলক বাক্য থেকে সদর্থক/ অস্ত্যর্থক বিবৃতিমূলক বাক্য :**

১. অবশ্য গাছের গতি হঠাৎ দেখা যায় না। > অবশ্য গাছের গতি প্রায় অদৃশ্য।

২. ইংলান্ডে গিয়ে আমি চিঠি না-দেওয়া পর্যন্ত ও চিঠির উত্তর দিও না। > ইংলান্ডে গিয়ে আমি চিঠি দিলে তবেই এ চিঠির উত্তর দিও।

৩. আমরা ছোকরার দল, আমাদের তেমন কোনো কাজকর্ম ছিল না। > আমরা ছোকরার দল, আমাদের কাজকর্ম খুব অল্পই ছিল।

৪. তাছাড়া তখন হয়তো এত মোটা ছিলেন না আপনারা। > তাছাড়া তখন হয়তো বেশ রোগা ছিলেন আপনারা।

৫. যেখানে অত্যাচার ও অপমানের আঘাত যথাসম্ভব কম আসে, সেই বন্দী-জীবনটা ততটা যন্ত্রণাদায়ক হয় না। > যেখানে অত্যাচার ও অপমানের আঘাত যথাসম্ভব কম আসে, সেই বন্দী জীবনটা তুলনায় কম যন্ত্রণাদায়ক।

৬. একটার সময় টিফিনের ছুটি হইলে হেয়ারের আর অন্য কাজ থাকিব না। > একটার সময় টিফিনের ছুটি হইলে হেয়ারের কেবল একটিই কাজ থাকিত।

৭. রঞ্জন সারাটা দিন আর বাড়ি থেকে বেরোয়নি। > রঞ্জন সারাটা দিন বাড়িতেই ছিল।

৮. তোকে অ্যালবাম দিতে হবে না। > তোর অ্যালবাম না দিলেও চলবে।

৯. লোকটা জানলই না। > লোকটার অজানা থাকল।

১০. মৃত্যুর পরে তো আমার কোনো স্বাধীনতার প্রয়োজন হবে না। > মৃত্যুর আগেই আমার যত স্বাধীনতার প্রয়োজন হবে।

- **সদর্থক/অস্ত্যর্থক বিবৃতিমূলক বাক্য থেকে প্রশ্নবোধক বাক্য :**

১. রৌদ্রে যেন ভিজে বেদনার গন্ধ লেগে আছে। > রৌদ্রে কি ভিজে বেদনার গন্ধ লেগে নেই?

২. অরণ্য, প্রান্তর, শূন্য তেপান্তর— সব পথে ঘুরেছি বৃথাই রে। > অরণ্য, প্রান্তর, শূন্য তেপান্তর — সব পথে বৃথাই ঘুরিনি কি?

৩. শিমুল গাছ অনেকে দেখিয়াছ। > শিমুল গাছ অনেকে দেখিয়াছ, নয় কি?

৪. ভোমরা যেত গুনগুনিয়ে ফোটা ফুলের পাশে। > ভোমরা কি যেত না গুনগুনিয়ে ফোটা ফুলের পাশে?

৫. সমস্ত বাধা নিষেধের বাইরেও আছে অস্তিত্বের অধিকার। > সমস্ত বাধা নিষেধের বাইরেও কি নেই অস্তিত্বের অধিকার?

৬. শুধু প্রান্তর শুকনো হাওয়ার হাহাকার। > শুধু প্রান্তর শুকনো হাওয়ার হাহাকার ছাড়া আর কী আছে?

৭. পান-চিবানো ঠোঁটের ফাঁকে এবং প্রশস্ত কপালে একটুখানি যেন বিদ্রুপের ছায়া। > পান-চিবানো ঠোঁটের ফাঁকে এবং প্রশস্ত কপালে একটুখানি বিদ্রুপের ছায়া ছাড়া আর কি?

৮. মণিকাদির হাততালির সঙ্গে আমরাও সকলে যোগ দিলাম। > মনিকাদির হাততালির সঙ্গে আমরাও সকলে কি আর যোগ না দিয়ে পারি?

৯. অর্ধেক এশিয়া মাসিডনের বিজয় বাহিনীর বীরপদভরে কম্পিত হয়েছে। > অর্ধেক এশিয়া কি মাসিডনের বিজয়বাহিনীর বীরপদভরে কম্পিত হয়নি?

১০. ডিম দিতে পারি, তবে, নিজের হাতে বার করে নিতে হবে বাক্স থেকে। > ডিম দিতে পারি, তবে, নিজের হাতে বার করে নিতে পারবি কি বাক্স থেকে?

- **নির্দেশ অনুযায়ী বাক্য পরিবর্তন করো :**

১. ফুলবাগানের মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দেখল নীলু। (না সূচক বাক্যে)

২. বাইরে থেকে দেখে বোঝা যেত না, কিন্তু কে জানে, হয়তো ওই জীবন তার আর ভালো লাগছিল না। (হ্যাঁ-সূচক বাক্যে)

৩. সেদিকটার দরজা বন্ধ। (না-সূচক বাক্যে)

৪. তাঁর হয়েছে বড়ো জ্বালা। (বিস্ময়-সূচক বাক্যে)

৫. বুড়ো চোখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিল। (প্রশ্নসূচক বাক্যে)

৬. দুপুরে খাওয়ার সময়টায় এক বেড়াল ছাড়া তার কাছাকাছি আর কেউ থাকে না বড়ো একটা। (হ্যাঁ-সূচক বাক্যে)

৭. তোর অধঃপাত দেখলে আমি কোথায় গিয়ে মুখ লুকোব? (প্রশ্ন পরিহার করো)

৮. তাঁর কানে যদি এসব কথা যায় তাহলে রক্ষে রাখবে ভেবেছিস? (হ্যাঁ-সূচক বাক্যে)

৯. ও মানুষের মর্ম তোমরা বুঝবে না। (হ্যাঁ-সূচক বাক্যে)

১০. মা বলল, আমরা কি অত জানতুম বাছা! (নির্দেশক বাক্যে)

১১. দোকানে বিক্রিবাটা কেমন হে? (প্রশ্নবাক্যটির প্রকার নির্দেশ করো)

১২. এগিয়ে চলতে হবে। (অনুজ্ঞাবাচক বাক্যে)

১৩. মশাল হাতে কালিঝুলি মাখা একটা লোক দাঁড়িয়ে। (না-সূচক বাক্যে)

১৪. আর বলবেন না মশাই। (হ্যাঁ-সূচক বাক্যে)

১৫. বকশিশের কথায় কাশীনাথ হেসে ফেলল। (না-সূচক বাক্যে)

১৬. বয়স তো বোধহয় সাতাশ-আঠাশ। (প্রশ্নবোধক বাক্যে)

১৭. খুব ভালো বলেছেন। (বিস্ময়বোধক বাক্যে)

১৮. খুব ভোরবেলায় উঠে অনেকটা দৌড়াতে হবে। (অনুজ্ঞাসূচক বাক্যে)

১৯. আশ্বিন মাসেও আজ ঘাম হচ্ছে। (না-সূচক বাক্যে)

২০. আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে, ঘটনাটা তত মিথ্যে নয়। (হ্যাঁ-সূচক বাক্যে)

চতুর্থ অধ্যায়

বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া

বাক্যের মধ্যে আমরা যেসব শব্দ ব্যবহার করি তার প্রতিটিই হলো এক একটি পদ। এই পদ তৈরি হয় শব্দের সঙ্গে শব্দবিভক্তি আর ধাতুবিভক্তি যুক্ত হয়ে। তাহলে পদ হলো শব্দের পরিবর্তিত একটি রূপ, যা দিয়ে আমরা বাক্যগঠন করি এবং মনের ভাবটিকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করি। যেমন—

জয়ের মাথা ধরেছে।

—এই বাক্যটিতে আমরা তিনটি পদের ব্যবহার লক্ষ করছি। যেগুলি তৈরি হয়েছে এভাবে—

শব্দ +	**শব্দবিভক্তি/ধাতুবিভক্তি**	**= পদ**
জয় +	এর	= জয়ের
মাথা +	শূন্য	= মাথা
ধরা +	ইয়াছে/এছে	= ধরেছে

বাংলা বাক্যে ব্যবহৃত এই পদগুলিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা পাঁচ ধরনের পদ লক্ষ করি। যেমন— বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া ও অব্যয়।

এবার আমরা একে একে এই পাঁচটি শ্রেণি পদ সম্পর্কে সামান্য আলোচনা ও তা ব্যবহারের বিশিষ্টতাগুলি নিয়ে চর্চা করব।

বিশেষ্য

গান্ধিজি হলেন জাতির জনক।

এই বাক্যে 'গান্ধিজি' পদটি দিয়ে একটি বিশেষ নামকে বোঝানো হয়েছে। এভাবে কোনো পদের দ্বারা আমরা যদি কোনো কিছুর নাম বোঝাতে চাই তাকেই বলে বিশেষ্য পদ। একে নাম বা নামপদও বলা হয়। যেমন —

গোরু গৃহপালিত পশু।

নজরুল দুই বাংলারই অবিস্মরণীয় কবি।

ভারতের উত্তরে **হিমালয়** পর্বতের অবস্থান।

গঙ্গা ভারতের দীর্ঘতম নদী।

ওপরের চারটি বাক্যের স্থূলাক্ষর পদগুলি হলো বিশেষ্য পদ।

এইভাবে ব্যক্তি, বস্তু, দ্রব্য, স্থান, কাল, পাত্রের নাম বোঝালেই বিশেষ্য পদ হবে।

বিশেষ্য পদকে আবার নানা শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন—

- **ব্যক্তি/সংজ্ঞাবাচক :** ভারত, দামোদর, কলকাতা, রামায়ণ ইত্যাদি।
- **জাতিবাচক :** পশু, পাখি, মানুষ, হিন্দু, মুসলমান ইত্যাদি।
- **পদার্থ/বস্তুবাচক :** মাটি, পাথর, লোহা, সোনা, চাল, গম ইত্যাদি।
- **গুণবাচক ও অবস্থাবাচক :** সুখ, দুঃখ, ভালোবাসা, শৈশব, যৌবন ইত্যাদি।

সর্বনাম পদ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার দেশের গৌরব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জোড়াসাঁকোয় জন্মগ্রহণ করেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাবার নাম দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা গান ভারতের জাতীয় সংগীত।

ওপরের বাক্য চারটিতে বারবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম ব্যবহার করা হয়েছে। এইভাবে নাম ব্যবহার না করে তার পরিবর্তে তিনি বা তাঁর শব্দটি ব্যবহার করতে পারি। এমন ব্যবহারে অর্থের পরিবর্তন ঘটে না, সেইসঙ্গে বাক্যগুলি শ্রুতিমধুর হয়।

যেমন —

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার দেশের গৌরব।

তিনি জোড়াসাঁকোয় জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর বাবার নাম দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তাঁর লেখা গান ভারতের জাতীয় সংগীত।

এইভাবে সাধারণত নামের বা বিশেষ্যের (আগে উল্লেখ করা হয়েছে এমন) পরিবর্তে যে পদ আমরা বাক্যে ব্যবহার করি তাকেই বলে সর্বনাম। যেমন— আমি, তুমি, সে, তাকে, ইনি, ওটা ইত্যাদি।

বাংলায় নানাধরনের সর্বনাম-এর ব্যবহার আমরা দেখতে পাই। যেমন—

- **পুরুষবাচক :** আমি, তুমি, সে ইত্যাদি।
- **সাকল্যবাচক :** সব, সকল, উভয় ইত্যাদি।
- **সাপেক্ষবাচক :** যে, যিনি, যা ইত্যাদি।
- **প্রশ্নসূচক:** কে, কি, কী ইত্যাদি।
- **আত্মবাচক :** নিজ, নিজে, আপনি ইত্যাদি।
- **অন্যাদি :** অন্য, পর, অপর ইত্যাদি।

- **ব্যতিহারিক :** আপনা-আপনি ইত্যাদি।
- **সামীপ্যবোধক :** এ, এটা, ইনি ইত্যাদি।
- **পরোক্ষবোধক :** ও, ওটা, উনি ইত্যাদি।

বিশেষণ

খোঁপায় বেঁধেছে **হলুদ** গাঁদার ফুল।

ওপরের বাক্যটিতে গাঁদা ফুলটির একটা বিশেষ গুণ উল্লেখিত হয়েছে। গুণটি হলো 'হলুদ'। যা কিনা গাঁদা ফুলকে এক বিশিষ্ট পরিচয় দান করেছে। এইভাবে বাক্যে ব্যবহৃত যেপদ কোনো কিছুকে বিশিষ্ট করে তাকেই বলে বিশেষণ। বিশেষণ শুধু যে বিশেষ্যকেই বিশেষিত করে তা নয়, অন্যান্য অর্থাৎ সর্বনাম, ক্রিয়া ইত্যাদি পদকেও বিশেষিত করে।

বাংলা ভাষায় বহু ধরনের বিশেষণের প্রয়োগ আমরা লক্ষ করি। যাকে আবার মূল চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যেমন—

- **বিশেষ্যের বিশেষণ :** **পাকা** বাড়ি। **পোষা** কুকুর। **অনেক** লোক। **অল্প** চুল।
  দুরাত। **তিন** বেলা। **প্রথম** শ্রেণি। **বিংশ** শতক।
  ধবধবে চাদর। **ঝিরঝিরে** বৃষ্টি।
- **সর্বনামের বিশেষণ :** **সে** কাল। **কী** ঝামেলা। **স্বকীয়** বৈশিষ্ট্য। **মদীয়** বাসভবন।
- **বিশেষণের বিশেষণ :** **খুব** ভালো নাটক। **কনকনে** ঠান্ডা বাতাস।
- **ক্রিয়া বিশেষণ :** **জোরে** হাঁটো। **সুখে** থেকো। **ক্রমাগত** চলছে।

ক্রিয়া

বরুণ ছবি **আঁকছে**।

বাক্যটিতে 'আঁকছে' পদটি দ্বারা একটি কাজ করা বোঝাচ্ছে। এই বাক্যটিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা এও দেখতে পাব যে, এখানে 'বরুণ' সম্বন্ধে কিছু বলা হচ্ছে। এইভাবে বাক্যে যার সম্বন্ধে কিছু বলা হয় সে হলো উদ্দেশ্য। আর এই উদ্দেশ্যের সম্বন্ধে যা বলা হয় তা হলো বিধেয়। এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য 'বরুণ' হচ্ছে কর্তা আর তার হওয়া বা কোনো কিছু করা যে শব্দ দ্বারা বোঝানো হলো তা হচ্ছে ক্রিয়া। যেহেতু এখানে 'আঁকছে' পদটি দিয়ে 'বরুণ'-এর কোনো কাজ করা বোঝানো হয়েছে তাই এই পদটি হলো ক্রিয়া।

এই ক্রিয়া বাক্যের বিধেয় অংশে থাকে। যেমন—

পাখি **ওড়ে**। সূর্য **ওঠে**। জল **পড়ে**।

বাক্যগুলিতে বিধেয় অংশে থাকা 'ওড়ে', 'ওঠে', 'পড়ে'-এই পদগুলি যথাক্রমে পাখি, সূর্য ও জলের কোনো কাজ করা বোঝাচ্ছে, তাই এরা একএকটি ক্রিয়াপদ।

ধাতুর পরিচয়

ক্রিয়াপদের মূলকে ধাতু বলা হয়। ধাতুর সঙ্গে ক্রিয়া বিভক্তি যুক্ত হয়ে ক্রিয়াপদ তৈরি হয়।

কয়েকটি উদাহরণ—

নাচ্ (ধাতু) + ছে (ক্রিয়া বিভক্তি) = নাচছে

কর্ (ধাতু) + বেন (ক্রিয়া বিভক্তি) = করবেন

চল্ (ধাতু) + ই (ক্রিয়া বিভক্তি) = চলি

কর্ (ধাতু) + লে (ক্রিয়া বিভক্তি) = করলে

বল্ (ধাতু) + লাম (ক্রিয়া বিভক্তি) = বললাম

সমাপিকা ক্রিয়া

'খোকা ঘুমাল
পাড়া জুড়াল
বর্গি এল দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেব কীসে?'

ওপরের কবিতাংশে 'খোকা **ঘুমাল**' 'পাড়া **জুড়াল**' 'বর্গি **এল** দেশে' 'বুলবুলিতে ধান **খেয়েছে**' 'খাজনা **দেব** কীসে' এই একটি বাক্যে ক্রিয়াপদগুলির দ্বারা সম্পূর্ণভাবে মনের ভার প্রকাশ পাচ্ছে। কোনো কিছু বলার বা শোনার বাকি থাকছে না।

ওপরের বাক্যগুলিতে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদগুলি সমপিকা ক্রিয়ার উদাহরণ।

যে ক্রিয়াপদ দ্বারা কোনো বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে।

করছে, বলছে, ঘুমাচ্ছে, চলি, বলি, আছি, হই, হলাম, এসেছি, জানি, গাইলাম, বসি প্রভৃতি সমাপিকা ক্রিয়ার উদাহরণ।

অসমাপিকা ক্রিয়া

সে বাড়ি **এসে**

সালাম মাঠে **গিয়ে**

ওপরের বাক্যাংশে **এসে, গিয়ে** ক্রিয়াপদ দ্বারা বাক্যের অর্থ পূর্ণ হচ্ছে না।

এইভাবে যে ক্রিয়ার দ্বারা বাক্যের অর্থ অসম্পূর্ণ থেকে যায় তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে।

খেয়ে, যেয়ে, বলে, মেরে, থামলে, থাকতে প্রভৃতি অসমাপিকা ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত।

এ, লে, তে প্রভৃতি বিভক্তি যোগে অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়।

অব্যয়

সুতপা মেধাবী মেয়ে **কিন্তু** ভীষণ অহংকারী।

কামাল পড়তে বসল **এবং** তপন খেলতে গেল।

ওপরের বাক্যদুটি লক্ষ করলে দেখব মোটা শব্দগুলি একটু নতুন ধরনের। দুটি বাক্যের মধ্যে 'কিন্তু', 'এবং',-এই শ্রেণির পদগুলির কোনো অবস্থাতেই রূপের পরিবর্তন হয় না। অর্থাৎ বাক্যে মধ্যে এই পদগুলির ব্যবহার সবসময় একই রকম থাকে। এদের কোনো ক্ষম বা ব্যয় নেই বলেই এরা 'অব্যয়' নামে চিহ্নিত। তাই বলা যায়, লিঙ্গ, বচন, পুরুষ ও বিভক্তি ভেদে যে পদের কোনোরকম পরিবর্তন হয় না, তাদের অব্যয় বলে।

যেমন : কিংবা, এবং, কেননা, আহা, মতো, তো, নচেৎ, কিন্তু, বরং, সুতরাং ইত্যাদি। অব্যয়কে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন— সংযোজক অব্যয়, আবেগসূচক অব্যয় এবং আলংকারিক অব্যয়।

(১) সংযোজক অব্যয়

আমি ভুটান যাব **এবং** তিনদিন থাকব।

মেঘলা **ও** তুমি আমার প্রিয় বন্ধু।

ওপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম বাক্যের মধ্যে সংযোগ ঘটিয়েছে **'এবং'**। দ্বিতীয় বাক্যে মেঘলা ও তুমি এই দুটি পদের মধ্যে সংযোগ ঘটিয়েছে **'ও'**। এইভাবে **এবং, ও** পদদুটো বাক্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংযোগ ঘটায় বলে এদের সংযোজক বলে।

যে পদ একাধিক বাক্য বা পদের মধ্যে সংযোগ ঘটায় তাদের সংযোজক অব্যয় পদ বলে। সংযোজক হলো — ও, এবং, আর, বা, যদি।

(২) আবেগসূচক অব্যয়

বাঃ, কী চমৎকার তোমার গানের গলা!

ইস্, একটুর জন্য ট্রেনটা ধরতে পারলাম না।

বাঃ, ইস্ প্রভৃতি পদে দিয়ে আবেগ প্রকাশ করা হয়েছে, তাই বাংলা ভাষায় এদের **আবেগসূচক অব্যয় পদ** বলে।

অব্যয়ের আরো কিছু উদাহরণ—

উহ্ কী ঠান্ডা। **ধেৎ,** লোডশেডিং হয়ে গেল। **শাবাশ,** দারুণ খেলেছ।

(৩) আংলকারিক অব্যয়

যাও **না,** কোনো অসুবিধে নেই।

আগে **তো** এসো, তারপর মেলায় যাবার কথা ভাবব।

ওপরের বাক্যমধ্যে **না, তো**— এই পদগুলি বাক্যের মধ্যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। এ যেন বাড়তি অলংকার। অলংকার যেমন দেহের সৌন্দর্য বাড়ায় তেমনই অলংকার বাক্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবং বাক্যটিকে শ্রুতিমধুর করে।

বলা যায়— **যে সমস্ত অব্যয় বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে তাদের আংলকারিক অব্যয় পদ বলে।**

প্রশ্নবোধক — কি, কেন, কেমন

১. ঠিক বিকল্পটি বেছে নিয়ে বাক্যটি আবার লেখো :

১.১ তোকে নিয়ে আর পারি না। — নিম্নরেখ অংশটি হলো :

(ক) বিশেষ্য (খ) বিশেষণ (গ) অব্যয় (ঘ) ক্রিয়া

১.২ তোমার কথা বলতে বলতেই তুমি চলে এলে। —এই বাক্যে অসমাপিকা ক্রিয়াটি হলো :

(ক) কথা বলতে বলতে (খ) বলতে বলতে (গ) এলে (ঘ) চলে এলে।

১.৩ মূলকে বলে —

(ক) সমাপিকা (খ) অসমাপিকা (গ) ধাতু (ঘ) প্রত্যয়

১.৪ ওর কথা আর তুমি বোলো না। ওকে কেউ পছন্দ করে না। আমি এটা জানি। — এই অংশে সর্বনামের সংখ্যা হলো —

(ক) ছয় (খ) সাত (গ) পাঁচ (ঘ) চার

১.৫ আমি এবং সুভাষ কলকাতায় যাবো। কিন্তু তুমি যে যাবে সেটাও আমার জানা।— এই অংশে অব্যয়ের সংখ্যা হলো

(ক) দুই (খ) তিন (গ) চার (ঘ) পাঁচ

২. নির্দেশ অনুযায়ী নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

২.১ বিশেষ্য পদকে কীভাবে চেনা যায়?

২.২ একই নামকে বারবার ব্যবহার না করে বাক্যে কোন পদটি ব্যবহার করা হয়?

২.৩ কোন পদের দ্বারা বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের গুণ, দোষ, অবস্থা, সংখ্যা ও পরিমাণ বোঝানো হয়ে থাকে?

২.৪ ক্রিয়া কীভাবে তৈরি হয়?

২.৫ তারা গাইতে গাইতে এদিকেই আসছে। —বাক্যটিতে সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া চিহ্নিত করো।

২.৬ আমি লিখি। — বাক্যটিতে ক্রিয়া বিশেষণ যোগ করে লেখো।

২.৭ ‘অব্যয়’ বলতে কী বোঝ?

৩. নীচের বাক্যগুলিতে কোনটি কোন শ্রেণির অব্যয় তা নির্দেশ করো :

৩.১ আমি আর তুমি সেখানে যাবো।

৩.২ বাঃ, চমৎকার বলেছ!

৩.৩ ‘এ তো মেয়ে মেয়ে নয়, দেবতা নিশ্চয়।’

৩.৪ শাবাস, এমন কাজ তো তোমাকেই মানায়।

৩.৫ তুমি বা সে সময়মতো আমার কাছে জিনিসটি পৌঁছে দেবে।

পঞ্চম অধ্যায়

ক্রিয়ার কাল ও ক্রিয়ার ভাব

'ক্রিয়া' শব্দের অর্থ সময়। অস্তিত্ববান যা কিছু সবই এই সময়ের অধীন। অনাদি অতীত থেকে অনন্ত ভবিষ্যৎ — কাল নিরবধি। কোনও কিছুই সময়ের গ্রাসের বাইরে নয়। বস্তুত সময় সব কিছুকে 'কলন' বা গ্রাস করে বলেই সময়ের আর এক নাম 'কাল'।

এই নিরবচ্ছিন্ন কালকে আমরা সুবিধার্থে তিনভাগে ভাগ করি। যে ঘটনা বা ক্রিয়াটি ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে, যার কিছুটা স্মৃতিধার্য আর বাকি পুরোটাই বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গিয়েছে — তাকে আমরা বলি অতীত। আর যে ঘটনা বা ক্রিয়া এখনও ঘটেনি, কিন্তু যা অনিবার্যভাবেই ঘটবে, অথবা ঘটবার সম্ভাবনা আছে, তাকে আমরা বলি ভবিষ্যৎ। বলা বাহুল্য অতীত ও ভবিষ্যৎ — দুই-ই অন্তহীন। আর এই দুই-এর মধ্যে মিলনসংযোগকারী ক্ষণটিকেই বলা হয় বর্তমান। এখন, এই মুহূর্তটিই শুধু বর্তমানকাল। এক মুহূর্ত আগের প্রদীপটি যেমন পর মুহূর্তে আর অভিন্ন নয়, কেননা তেল কমে গেছে, শিখার আকার পরিবর্তিত হয়েছে, সলতেও খানিকটা পুড়ে গেছে, তবু বিভিন্ন ক্ষণে একটিই প্রদীপ দেখছি বলে মনে হয় আমাদের, তেমনই অতীত থেকে ভবিষ্যতের পথে এই অভিযাত্রায় বর্তমান ক্ষণটির অবতারণা। অনাদি অতীতের অজস্র ও জটিল কর্মপ্রবাহের কার্য-কারণ সূত্রে তার প্রস্তাবনা আর ভবিষ্যতের অসীম সম্ভাবনায় তার বিলয় তথা রূপান্তর। অর্থাৎ, কালের তিনটি প্রধান ভাগ : (ক) অতীত, (খ) বর্তমান, (গ) ভবিষ্যৎ।

এই কাল তথা সময়ের উপরে নিয়ন্ত্রণের ইচ্ছা মানুষের ইতিহাসের প্রথম দিন থেকেই লক্ষ করা গেছে। মানুষ কখনও চেয়েছে অমর হতে। চিরযৌবনের অধিকারী হতে, আবার কখনও চেয়েছে টাইম মেশিন বা সময়যান তৈরি করে সময়ের বিভিন্ন মাত্রায় পরিভ্রমণ করতে। পুরাণ থেকে কল্পবিজ্ঞান — সর্বত্রই কালকে নিয়ে মানুষের চিন্তা ও কল্পনার ব্যাপ্তি আমাদের অভিভূত করে। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতার মতো সময়কেও বস্তুজগতের একটি মাত্রা হিসেবে বিজ্ঞান নির্দিষ্ট করে চিহ্নিত করে দেবার পরে এই জল্পনা বেড়েছে বই কমেনি। সময়কে পরিমাপেরই বা কত ব্যবস্থা। সূর্যকে ঘিরে পৃথিবীর আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি বা পৃথিবীকে ঘিরে চাঁদের পরিভ্রমণের মতো মহাজাগতিক বিষয়ের সঙ্গে তার কারবার। আবার তুলনায় ছোটো এককেরও কত রকমফের।

তার পরিমাপের যন্ত্রেরও কত বিবর্তন। সূর্যঘড়ি, জলঘড়ি, বালুঘড়ি থেকে শুরু করে আজকের ন্যানো সেকেন্ড বা তার চেয়েও ছোটো একক মাপবার ক্ষমতাসম্পন্ন ডিজিটাল ওয়াচ — ঘড়ির বিবর্তনের ইতিহাসও কিছু কম আকর্ষণীয় নয়।

ভাষা আমাদের চিন্তার বাহন, এমনকি মাধ্যমও। তাই পৃথিবীর সমস্ত ভাষাতেই বিভিন্ন কালবাচক নানাশব্দের মতোই বিভিন্নকালে ক্রিয়ার বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। ক্রিয়ার ওপরেই কালের প্রভাব পড়ে এবং বিভিন্ন কালবাচক বিভক্তি ক্রিয়াগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের বিভিন্ন কালে ব্যবহারের যোগ্যতা প্রদান করে। আবার সূক্ষ্মতার বিচারে একই কালের ক্রিয়ারও বিভিন্ন রূপভেদ দেখা যায়। কালানুক্রম-অনুসারে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ — এই ক্রমেই আলোচনা বিধেয় হলেও বোঝানোর সুবিধার্থে আমরা প্রথমে বর্তমানকাল ও তার রূপভেদগুলি নিয়ে আলোচনা করব। এরপরে যথাক্রমে অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল ও তাদের রূপভেদগুলি নিয়ে কথা বলার অবসর পাওয়া যাবে।

বর্তমান কাল

যে ক্রিয়া এখন, বর্তমানে সংঘটিত হচ্ছে, তার কালকে বলা হয় বর্তমান কাল। আগেই বলা হয়েছে, অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে সংযোগকারী এই বর্তমান। সূক্ষ্মতার বিচারে এরও আবার নানারকম প্রকারভেদ আছে। এই প্রকারভেদ অনুযায়ী বর্তমান কালের পরিসরের মধ্যেই বিভিন্ন রূপের ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন :

‘হেথায় মানুষ বসত **করে**।’

‘তোমাকে সেই সকাল থেকে তোমার মতো মনে **পড়ছে**।’

‘তাই এখন পথে এসে **দাঁড়িয়েছে** সড়কের মাঝখানে।’

‘তবে লিস্টি **কর**।’

দৃষ্টান্তগুলিতে ‘করে’, ‘পড়ছে’, ‘দাঁড়িয়েছে’ এবং ‘কর’ — এই ক্রিয়াপদগুলি সবই বর্তমানকালের। কিন্তু তাদের রূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, বাক্যের কর্তা পুরুষ বা পক্ষ-অনুসারে ক্রিয়ার মূল ধাতুর সঙ্গে পৃথক পৃথক পুরুষ-বাচক বিভক্তি যুক্ত হয়। তার আগে ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয় কালবাচক প্রত্যয়টি।

ক্রিয়া-সংঘটনকালে সূক্ষ্মতা অনুযায়ী ক্রিয়ার বর্তমান কালকে চারপ্রকারে ভাগ করা হয়ে থাকে : (১) সাধারণ বা নিত্য বর্তমান, (২) ঘটমান বর্তমান, (৩) পুরাঘটিত বর্তমান ও (৪) বর্তমান কালের অনুজ্ঞা।

(১) সাধারণ বা নিত্য বর্তমান :

যেখানে ক্রিয়াটি স্বাভাবিকভাবে ঘটে অথবা চিরকাল ধরে ঘটে থাকে, তার কালকে সাধারণ বর্তমান বা নিত্য বর্তমান বলে। সাধারণ বা নিত্য বর্তমানে মূলধাতুর সঙ্গে কোনো কালবাচক প্রত্যয় যুক্ত হয় না। উত্তম, মধ্যও ও প্রথম পুরুষে যথাক্রমে ‘ই’, ‘অ’ এবং ‘এ’- পুরুষবাচক বিভক্তি যুক্ত হয়। মধ্যম পুরুষের সম্ভ্রমার্থে ‘এন’ এবং তুচ্ছার্থে/নৈকট্য বোঝাতে ‘ইস’ যুক্ত হয়ে থাকে। এইভাবে ‘কর’ ধাতুর উত্তম পুরুষে ‘কর্’ + ই = করি, মধ্যমপুরুষে ‘কর্’ + অ = কর, ‘কর্’ + এন = করেন [সম্ভ্রমার্থে], ‘কর্’ + ইস্ = করিস (তুচ্ছার্থে/নৈকট্য বোঝাতে) এবং প্রথম পুরুষে ‘কর্’ + এ =

করে, ‘কর’ + এন = করেন [সম্ভ্রমার্থে] রূপ হয়। যেমন : ‘মন্ত্রশক্তিতে তোমরা বিশ্বাস **কর** না, কারণ আজকাল কেউ **করে** না, কিন্তু আমি **করি**।’

(ক) ঐতিহাসিক বর্তমান : সাধারণ বর্তমান বা নিত্যবর্তমান কালের ক্রিয়াকে অতীতকালে সংঘটিত কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনায় অভিন্নরূপে ব্যবহার করলে তার কালকে ঐতিহাসিক বর্তমান কাল বলা হয়ে থাকে। যেমন : ‘বিশ্বভারতী তাঁকে দেশিকোত্তম (ডি.লিট) উপাধিদানে সম্মানিত **করেন**।’

(খ) অতীতকালের অর্থে বর্তমানকালের ক্রিয়ার ব্যবহার : অনেক সময় অতীতকাল বোঝাতে বর্তমান কালের ক্রিয়ার তির্যক ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমনি :

‘আমি যখন শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ **দিই** তখনো অভিধানের মুদ্রণকার্য শেষ **হয়নি**।’

(২) ঘটমান বর্তমান :

যে ক্রিয়ার কাজ এখনও সংঘটিত হচ্ছে, তার কালকে বলা হয় ঘটমান বর্তমান। ঘটমান বর্তমানে মূলধাতুর সঙ্গে ‘ইতে’ অসমাপিকা ক্রিয়া প্রত্যয়, ‘আছ্’ ধাতু এবং পুরুষ বাচক ক্রিয়াটি বিভক্তি [অর্থাৎ ‘ই’, ‘অ’, এবং ‘এ’] যোগ করে ক্রিয়া রূপ গঠিত হয়। উত্তম পুরুষে ‘কর্’ ধাতু + ইতে + ‘আছ্’ ধাতু + ই = করিতেছি, মধ্যম পুরুষে ‘কর্’ ধাতু + ইতে + ‘আছ্’ ধাতু + অ [এন, এস] = করিতেছ [করিতেছেন, করিতেছিস] এবং প্রথম পুরুষে ‘কর্’ ধাতু + ইতে + ‘আছ’ ধাতু + এ [এন] = করিতেছে [করিতেছেন] হয়। চলিত ভাষায় এদের রূপ হবে : করছি, করছ [করছেন, করছিস], করছে [করছেন]। যেমন :

‘তিনি কলকাতায় **আসছেন** সেতার বাজাতে।’

‘ঠিক এই সময় আমি ভেসে **চলেছি** বিখ্যাত সেই ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়ে।’

‘মানুষই ফাঁদ **পাতছে**।’

(৩) পুরাঘটিত বর্তমান :

যে ক্রিয়াটি সংঘটিত হয়ে গেলেও তার ফল এখনও বর্তমান, তার কালকে বলা হয় পুরাঘটিত বর্তমান। পুরাঘটিত বর্তমানে মূল ধাতুর সঙ্গে ‘ইয়া’ অসমাপিকা ক্রিয়া-প্রত্যয়, ‘আছ্’ ধাতু এবং বিভিন্ন পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি [‘ই’, ‘অ’ এবং ‘এ’] যুক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ারূপের গঠন হয়ে থাকে। যেমন, উত্তম পুরুষে ‘কর্’ ধাতু + ইয়া + ‘আছ্’ ধাতু + ই = করিয়াছি, মধ্যম পুরুষে ‘কর্’ ধাতু + ইয়া + ‘আছ্’ + অ [এন, ইস্] = করিয়াছি [করিয়াছেন, করিয়াছিস] এবং প্রথম পুরুষে ‘কর্’ ধাতু + ইয়া + ‘আছ্’ ধাতু + এ (এন) = করিয়াছে (করিয়াছেন) রূপ হয়। চলিতভাষায় এদের রূপ হবে যথাক্রমে : করেছি, করেছ [করেছেন, করেছিস], করেছে [করেছেন]। যেমন :

‘দেখতে দেখতে গুচ্ছে গুচ্ছে উথলে **উঠেছে** ফুল
ঢেলে **দিয়েছে** বুকের সুগন্ধ।
উড়ে **এসেছে** রং-বেরঙের পাখি
শুরু **করেছে** কলকণ্ঠের কাকলি।’

(৪) বর্তমান কালের অনুজ্ঞা :

বর্তমান কালে প্রার্থনা, উপদেশ, অনুরোধ, অনুমতি ইত্যাদি বোঝাতে বর্তমান কালের অনুজ্ঞার ব্যবহার হয়। এ সম্পর্কে আমরা আরো বিস্তারিত জানব ‘ক্রিয়ার ভাব’ অংশে।

অতীত কাল

যে ক্রিয়া ইতিপূর্বে সংঘটিত হয়ে গেছে এবং যার রেশ বর্তমানে আর অনুভূত হয় না, তার কালকে অতীত কাল বলা হয়।যেমন :

'সকলেই অবাক হইয়া **তাকাইত**, তিনি ভ্রূক্ষেপ মাত্র **করিতেন** না।'

ক্রিয়া-সংঘটনকালের সূক্ষ্মতার বিচারে অতীত কালকেও চারভাগে ভাগ করা হয়। যথা — (১) সাধারণ বা নিত্য অতীত, (২) ঘটমান অতীত, (৩) পুরাঘটিত অতীত ও (৪) নিত্যবৃত্ত অতীত। স্বাভাবিকভাবেই এই কাল-বিভাগ অনুসারে অতীত কালের ক্রিয়ারও ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়ে থাকে।

(১) সাধারণ বা নিত্য অতীত :

যে ক্রিয়া অতীতে নিষ্পন্ন হয়ে গেছে এবং যার ফলও বর্তমান নেই, তার কালকে সাধারণ অতীত বা নিত্য অতীত বলা হয়। সাধারণ বা নিত্য অতীতে মূল ধাতুর সঙ্গে অতীত কাল-বাচক 'ইল্' প্রত্যয় এবং পুরুষ অনুসারে ক্রিয়াবিভক্তি (আম, এ, অ, এন, ই) যুক্ত হয়ে ক্রিয়া-রূপের গঠন করে।

'কর্' ধাতুর উত্তম পুরুষে 'কর্' + 'ইল্' + আম = করিলাম, মধ্যমপুরুষে 'কর্' + ইল্ + এ [এন] = করিলে [করিলেন] এবং প্রথম পুরুষে 'কর্' + ইল্ + অ [এন] = করিল [করিলেন] রূপ হয়ে থাকে। চলিত ভাষায় এদের রূপ যথাক্রমে হবে করলাম, করলুম, করলেম, করলে, করলি, করল এবং করলেন। যেমন :

'রিকশাগাড়ির সবটুকু খোলের মধ্যে এদের জায়গা **হয়েছিল** কী করে?

'কেন ওরকম কথা **বললি**?'

'রবিকাকাকে **বললুম**, ছেড়ো না, আমরা শেষ পর্যন্ত লড়ব এজন্য।'

(২) ঘটমান অতীত :

যে ক্রিয়াটি অতীত কালে সংঘটিত হচ্ছিল, তার কালকে ঘটমান অতীত বলা হয়। ঘটমান অতীতে মূল ধাতুর সঙ্গে 'ইবে' প্রত্যয়। 'আছ্' ধাতু অতীতকালবাচক 'ইল্' প্রত্যয় এবং পুরুষ অনুযায়ী ক্রিয়াবিভক্তি [আম, এ, এন, ই] যুক্ত হয়ে ক্রিয়া রূপ গঠিত হয়।

'কর্' ধাতুর উত্তম পুরুষে 'কর্' + ইতে + 'আছ্' + ইল + আম = করিতেছিলাম মধ্যম পুরুষের ক্ষেত্রে 'কর' + ইবে + 'আছ্' + ইল্ + এ [এন, ই] = করিতেছিলে [করিতেছিলেন, করিতেছিলি] এবং প্রথম পুরুষের ক্ষেত্রে 'কর্' + ইতে + 'আছ্' + ইল + অ [এন] = করিতেছিল [করিতেছিলেন] রূপ হয়ে থাকে।

চলিতভাষায় এই রূপগুলি হয় যথাক্রমে করছিলাম, করছিলুম, করছিলেন, করিতেছিলেম, করছিলে, করছিলি, করছিলিস, করছিল এবং করছিলেন। যেমন :

'ওই চেঁচামেচির মধ্যেই দু-একজন দু-একটা কথা বলতে চেষ্টা **করছিলেন**'।

'একটা চাপা বেদনা ওকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে **ফেলছিল**।'

'ওই পথ দিয়ে জরুরি দরকারে **যাচ্ছিলাম** ট্যাক্সি করে।'

(৩) পুরাঘটিত অতীত :

অতীতকালে সংঘটিত হয়েছিল, এমন ক্রিয়ার কালকে পুরাঘটিত অতীত বলা হয়। পুরাঘটিত অতীতে মূলধাতুর সঙ্গে 'ইয়া' প্রত্যয়, 'আছ্' ধাতু, অতীতকালবাচক 'ইল' প্রত্যয় এবং সর্বশেষে পুরুষানুযায়ী ক্রিয়াবিভক্তি [এ , অ , এন ,ই] যুক্ত হয়ে বিভিন্ন ক্রিয়া-রূপের গঠন করে।

'কর ' ধাতুর উত্তম পুরুষে 'কর্' + ইয়া + 'আছ্' + ইল্ + আম = করিয়াছিলাম, মধ্যমপুরুষে 'কর্' + ইয়া + 'আছ্' + ইল্ + এ [এন, ই] = করিয়াছিলে [করিয়াছিলেন, করিয়াছিলি] এবং প্রথমপুরুষে 'কর্' + ইয়া + 'আছ্' + ইল্ + অ [এন] = করিয়াছিল [করিয়াছিলেন] রূপ হয়ে থাকে।

চলিতভাষায় এই রূপগুলি যথাক্রমে করছিলাম, করেছিলি, করেছিলিস, করেছিল এবং করেছিলেন হয়। যেমন :

'মুর সেনাপতি কতিপয় মুহূর্ত পূর্বে প্রস্থান **করিয়াছিলেন**।'

'ওইরকম খেয়ে খেয়েই শরীরখানা ঠিক **রেখেছিলেন** ভদ্রলোক।'

(৪) নিত্যবৃত্ত অতীত :

অতীতে প্রায়ই ঘটত — এই অর্থে ক্রিয়ার যে কাল হয়, তাকে নিত্যবৃত্ত অতীত বলা হয়। নিত্যবৃত্ত অতীতে মূলধাতুর সঙ্গে অতীত কালবাচক 'ইত' প্রত্যয় এবং পুরুষ অনুসারে [আম, এ, অ, এন] ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হয়ে ক্রিয়ারূপ গঠন করে। 'কর' ধাতুর উত্তম পুরুষে 'কর্' + ইত + আম = করিতাম, মধ্যম পুরুষে 'কর্' + ইত + এ [এন্ ইস্] = করিতে (করিতেন, করিতিস) এবং প্রথম পুরুষে 'কর্' + ইত + অ [এন] = করিত [করিতেন] রূপ দেখতে পাওয়া যায়।

চলিতভাষায় এই রূপগুলি হয় যথাক্রমে : করতাম, করতুম, করতেম, করতে, করতেন, করতিস, করত এবং করতেন। যেমন :

'একটুখানি শ্যামল-ঘেরা কুটিরে তার স্বপ্ন শতশত দেখা **দিত** মনের শিষের ইশারাতে

'ঘুঘুডাকা ছায়ায় ঢাকা গ্রামখানি কোন মায়া ভরে শ্রান্তজনে হাতছানিতে **ডাকত** কাছে

'হাতের কাছে খাবার এলেই তলিয়ে **দিতেম**।'

ভবিষ্যৎ কাল

যে ক্রিয়াটি এখনও সংঘটিত হয়নি, তার কালকে ভবিষ্যৎ কাল বলা হয়, যেমন — 'নৌকা না পাই সাঁতারেই পার **হমু** বুড়িগঙ্গা।'

ভবিষ্যৎ কালকেও চারভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা — (১) সাধারণ ভবিষ্যৎ, ঘটমান ভবিষ্যৎ, (৩) পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ এবং (৪) ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞা।

স্বাভাবিক ভাবেই এই কালবিভাগ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ারূপ গঠিত হয়ে থাকে।

(১) সাধারণ ভবিষ্যৎ :

যে ক্রিয়া এখনও সংঘটিত হয়নি, কিন্তু পরে নিশ্চিতভাবেই হবে তার কালকে সাধারণ ভবিষ্যৎ

বলা হয়। সাধারণ ভবিষ্যতে মূল ধাতুর সঙ্গে ভবিষ্যৎ কালবাচক 'ইত্' প্রত্যয় এবং পুরুষানুযায়ী ক্রিয়া বিভক্তি [অ, এ, এন, ই] যুক্ত হয়ে ক্রিয়ারূপ গঠিত করে।

'কর্' ধাতুর উত্তম পুরুষে 'কর্' + ইন্ + অ = করিব, মধ্যমপুরুষে 'কর্' + ইন্ + এ [ই, এন] = করিবে [করিবি, করিবেন] এবং প্রথম পুরুষে 'কর্' + ইন্ + এ [এন] = করিবে [করিবেন] — এই ক্রিয়ারুপগুলি হয়ে থাকে। চলিত বাংলায় এদের রূপগুলি হয় যথাক্রমে : করব, করবে, করবি, করবেন। যেমন :

'ক্রমে এসব কথা তোমাদিগকে **বলিব**।'

'ওখান দিয়ে গেলেই গাড়ি থামিয়ে লিফট **চাইবে**।'

'**বলবি**, তুই বাঁধ পাহাড়া দিচ্ছিলি'

(২) ঘটমান ভবিষ্যৎ :

যে ক্রিয়াটি ভবিষ্যতে সংঘটিত হতে থাকবে, তার কালকে ঘটমান ভবিষ্যৎ বলা হয়। ঘটমান ভবিষ্যতে মূল ধাতুর সঙ্গে 'ইতে' প্রত্যয় যুক্ত হয় এবং তারপর 'আছ্' ['থাক্' আদেশ] ধাতুর সঙ্গে ভবিষ্যৎ কালবাচক 'ইব্' প্রত্যয় ৪এবং পুরুষ অনুসারে [অ, এ, এন, ই] ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হয়ে ক্রিয়ারূপ গঠন করে, লক্ষণীয় 'আছ' এখানে 'থাক্' - আকার ধারণ করে থাকে।

'কর্' ধাতুর উত্তম পুরুষে 'কর্' + ইতে + 'থাক্' + ইব্ + অ = করিতে থাকিব, মধ্যমপুরুষে 'কর' + ইতে + 'থাক্' + ইব্ + এ [ই, এন] = করিতে থাকিবে [করিতে থাকিবি, করিতে থাকিবেন] এবং প্রথম পুরুষে 'কর্' + ইতে + 'থাক্' + ইব্ + এ [এন] = করিতে থাকিবে [করিতে থাকিবেন] — রূপগুলি তৈরি হয়ে থাকে।

চলিত বাংলা রূপগুলি হয়, যথাক্রমে : করতে থাকব, করতে থাকবে, করতে থাকবি, করতে থাকবেন। যেমন :

তুমি যখন পরীক্ষার পড়া **পড়তে থাকবে**, তখন আমি পৃথিবীর পথে **হাঁটতে থাকব**।

সে তখনও নেচে নেচে গান গাইতে **থাকবে**।

যতই বাধা থাক, তুমি কি **এগোতে থাকবে না**?

(৩) পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ বা পুরাঘটিত সম্ভাব্য (সম্ভাব্য অতীত) :

ভবিষ্যৎকালে কোনো ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়ে থাকবে, অর্থাৎ ভবিষ্যতে কোনো ক্রিয়া সম্ভবত সংঘটিত হতে পারবে — এই অর্থে ক্রিয়ার কালকে পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ বলে। মজার কথা, পুরাঘটিত ভবিষ্যতের ক্রিয়াটি অতীতের ভাবও কিছুটা বহন করে, আর বহন করে সম্ভাব্যতা ও সংশয়ের ভাব। তাই একে সম্ভাব্য অতীতও বলা হয়ে থাকে।

পুরাঘটিত ভবিষ্যতে মূল ধাতুর সঙ্গে 'ইয়া' প্রত্যয়, তারপরে 'আছ' [ও 'থাক' আদেশ] ধাতু এবং ভবিষ্যৎ কালবাচক 'ইব্' প্রত্যয়ের সঙ্গে পুরুষ অনুযায়ী বিভিন্ন ক্রিয়াবিভক্তি [অ, এ, এন, ই] যুক্ত হয়ে ক্রিয়ারূপ তৈরি করে।

'কর' ধাতুর উত্তম পুরুষে 'কর্' + ইয়া + 'থাক্' + ইব্ + অ = করিয়া থাকিব, মধ্যম পুরুষে 'কর্' + ইয়া + 'থাক্' + ইব্ + এ [ই, এন] করিয়া থাকিবে করিয়া থাকিবি, করিয়া থাকিবেন এবং প্রথম পুরুষে 'কর্' + ইয়া + 'থাক্' + ইব + এ [এন] = করিয়া থাকিবে (করিয়া থাকিবেন) — রূপগুলি হয়।

চলিত বাংলায় রূপগুলি যথাক্রমে, করে থাকব, করে থাকবে, করে থাকবি, করে থাকবেন হয়ে থাকে। যেমন :

কেউ জানবে না, কোনদিন সে হয়তো **জিতে বসে থাকবে**।

তুমি যখন আসিবে তখনও তিনি **না খাইয়া থাকিবেন**।

তুমি এক গোল দিতে না দিতেই আমি দশ গোল **দিয়ে বসে থাকব**।

(৪) ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞা :

প্রার্থনা, আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ ইত্যাদির কার্য-সংঘটন কাল ভবিষ্যতে বোঝালে যে অনুজ্ঞা হয় তাকে ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞা বলে। এ সম্পর্কে আমরা আরো বিস্তারিত জানব 'ক্রিয়ার ভাব' অংশে।

মৌলিক কাল ও যৌগিক কাল

'রূপ' ও অর্থ অনুসারে ক্রিয়ার কালকে দুভাগে ভাগ করা যায়, যথা — ১. মৌলিক কাল বা সরল কাল এবং ২. যৌগিক কাল।

(১) মৌলিক কাল বা সরল কাল :

যেখানে ধাতুর সঙ্গে অন্য কোনো ধাতু যুক্ত না হয়ে কেবল ক্রিয়া বিভক্তি যুক্ত হয়ে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়, তার কালকে বলা হয় মৌলিক কাল বা সরল কাল।

সাধারণ/নিত্য বর্তমান, সাধারণ/নিত্য অতীত, নিত্যবৃত্ত অতীত, সাধারণ ভবিষ্যৎ — এই চারটি মৌলিক বা সরল কালের উদাহরণ।

(২) মিশ্রকাল বা যৌগিককাল :

মূল ধাতুর সঙ্গে অন্য কোনো ধাতু ও ক্রিয়া বিভক্তি যুক্ত হয়ে যে ক্রিয়াপদ গঠিত হয় তার কালকে মিশ্রকাল বা যৌগিক কাল বলা হয়ে থাকে। বাংলায় যৌগিক কাল-রূপ দশটি যথাক্রমে : ঘটমান বর্তমান, পুরাঘটিত বর্তমান, ঘটমান অতীত, পুরাঘটিত অতীত, ঘটমান ভবিষ্যৎ, পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ বা পুরাঘটিত সম্ভাব্য বা সম্ভাব্য অতীত, নিত্যবৃত্ত বর্তমান, নিত্যবৃত্ত ঘটমান বর্তমান, ঘটমান পুরা নিত্যবৃত্ত এবং পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত বা পুরাসম্ভাব্য নিত্যবৃত্ত।

ক্রিয়ার ভাব

বাক্যে ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার রীতিকে বলা হয় ক্রিয়ার ভাব বা প্রকার। ক্রিয়ার ভাব বা প্রকারকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায় : (১) নির্দেশক ভাব, (২) অনুজ্ঞা ভাব ও (৩) আপেক্ষিক ভাব।

১. নির্দেশক ভাব : যখন কোনো ক্রিয়ার মাধ্যমে কোনো কাজ হওয়া বা না হওয়া বোঝায়, এমনকি কোনো প্রশ্ন বা বিস্ময়ের দ্বারা কাজটি নির্দেশিত হয়, তখন তাকে নির্দেশক বা নির্ধারক বা অবধারক ভাব বলা হয়। যেমন :

‘শুনেছি সিন্ধুমুনির হরিণ-আহ্বান।’

‘সত্য সেলুকস! কী বিচিত্র এই দেশ!

‘তোমাদের সব কাজ কি কবিতায় হবে?’

২. **অনুজ্ঞা ভাব :** কিছু করার আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, অনুমতি, আশীর্বাদ, কামনা বা প্রার্থনা ইত্যাদি বোঝানোর সময় ক্রিয়ার যে বিশেষ রীতি প্রযুক্ত হয়, তাকে অনুজ্ঞা ভাব বলে। যেমন :

‘সভার কাজ শুরু করে দাও সভানেত্রী।’ (আদেশ)

‘ভুলে যা ভাই, কাহার সঙ্গে কতটুকুন তফাৎ হলো।’ (উপদেশ)

‘ভুল করে যদি ভুল লিখে ফিলি, নম্বর তবু দিও।’ (প্রার্থনা)

‘দেখিস, আমাদের ভুলিসনে।’ (অনুরোধ)

‘কাল’-এর দিক থেকে অনুজ্ঞাকে দুভাগে দেখা হয়— বর্তমান কালের অনুজ্ঞা ও ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞা।

(ক) বর্তমান কালের অনুজ্ঞা :

বর্তমান কালে প্রার্থনা, উপদেশ, অনুরোধ, অনুমতি ইত্যাদি বোঝাতে বর্তমান কালের অনুজ্ঞার ব্যবহার হয়। এটি কেবলমাত্র মধ্যম পুরুষ ও প্রথম পুরুষের ক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়ে থাকে। বর্তমান কালের অনুজ্ঞার সচরাচর মূল ধাতুর সঙ্গে ‘উন্’, ‘ইস্’, ‘উক’ — এই প্রত্যয়গুলি যুক্ত হয়ে ক্রিয়া-রূপ গঠিত হয়ে থাকে। ‘কর’ ধাতুর বর্তমানকালের অনুজ্ঞায় মধ্যম পুরুষে ‘কর্’ + ও = করো, সম্ভ্রমার্থে ‘কর্’ + উন = করুন এবং তুচ্ছার্থে/নৈকট্য বোঝাবে ‘কর্’ + ইস্ = করিস রূপ হয়। আর প্রথম পুরুষে ‘কর্’ + উক = করুক এবং সম্ভমার্থে ‘কর্’ + উন = করুন রূপ হয়ে থাকে। যেমন :

‘না পাবো তো চিনা বাক্যে ‘চুপ করিয়া ডুবে **যেয়ো**।’

‘প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আগে অহবা **দাও** প্রাণ।’

‘আপনি সত্বর প্রস্থান **করুন**।’

(খ) ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞা :

প্রার্থনা, আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ ইত্যাদির কার্য-সংঘটন কাল ভবিষ্যতে বোঝালে যে অনুজ্ঞা হয় তাকে ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞা বলে। এখানে মূল ক্রিয়ার সঙ্গে ভবিষ্যৎ কালবাচক ‘ইব’ প্রত্যয় এবং মধ্যম ও প্রথম পুরুষের ‘এ’ অথবা ‘ইও’ ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হয়। উত্তমপুরুষে অনুজ্ঞা হয় না।

‘কর’ ধাতুর ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞায় মধ্যম পুরুষে ‘কর্’ + ইব্ + এ = করিবে অথবা কর্ + ইও = করিও হয়। তুচ্ছার্থে ‘ইস্’ এবং সম্ভ্রমার্থে ‘হবেন’ ক্রিয়া-বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন, ‘কর্’ + ইস্ = করিস এবং ‘কর্’ + হবেন = করিবেন। যেমন :

যেও না, রজনি তুমি লয়ে তারাদলে।

কখনো মিথ্যা কথা **বলবে না**।

পিতামাতাকে ভক্তি **করিবে**।

তবে মনে রাখা উচিত, আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, ‘অনুজ্ঞা ক্রিয়ার স্বতন্ত্র কোনও কাল-রূপ নহে, ক্রিয়ার বিশিষ্ট এক ভাব।’

৩. আপেক্ষিক ভাব :

কোনো মিশ্র বা জটিল বাক্যে যদি একটি বাক্যের অর্থ অন্য একটি বাক্যের অপেক্ষায় থাকে তবে তা যে বাক্যটির অর্থের অপেক্ষায় থাকে, তার ক্রিয়াভাবকে আপেক্ষিকভাব বা ঘটনান্তরাপেক্ষিত ভাব বলা হয়। যেমন :

'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না **আসে** তবে একলা চলোরে'

'অকপটে মানুষ যদি মানুষকে **ভালোবাসে**, তবে তাহা বৃথা যায় না।'

'তুমি যদি বদলে দিতে **না পারো** তাহলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরবে হবে।'

ক্রিয়া বিভক্তি

কাল ও পুরুষানুসারে যে ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্রিয়াপদ গঠন করে, সেই ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছকে ধাতু-বিভক্তি বা ক্রিয়া-বিভক্তি বলে। যেমন : 'কর্' [মূলধাতু] + 'ইত্' + এন = করিতেন। এখানে 'ইত্' কালবাচক প্রত্যয় এবং 'এন্' পুরুষবাচক বিভক্তি, 'ইত'-এর মতো 'ইল্' বা 'ইব্' প্রভৃতি অন্যান্য কালবাচক প্রত্যয়। বাংলায় কালবাচক প্রত্যয় এবং পুরুষবাচক বিভক্তি যুক্ত হয়ে ক্রিয়া-বিভক্তি গঠিত হয়। সংস্কৃতে ধাতু বিশেষ এবং বচন বিশেষের জন্য কালবাচক প্রত্যয় এবং পুরুষবাচক বিভক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপ আছে। বাংলায় কিন্তু একই প্রত্যয় ও বিভক্তি যুক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। যেমন, একই 'ইত' প্রত্যয় এবং 'এন' বিভক্তি যোগে 'কর্' ধাতু থেকে 'করিতেন', 'যা' ধাতু থেকে 'যাইতেন', 'লিখ্' ধাতু থেকে 'লিখিতেন' প্রভৃতি ক্রিয়া তৈরি হয়ে থাকে। স্মরণীয় যে, যৌগিক ক্রিয়ারূপ গঠনে 'আছ্' ধাতুর যোগ অপরিহার্য। যেমন : 'কর্' + ইয়া + আছ্ + ই = করিতেছি, ভবিষ্যতে 'আছ্' ধাতুর 'থাক্' —আদেশ হয়ে থাকে।

এখানে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন পুরুষের ক্রিয়া-বিভক্তির রূপ দেওয়া হলো :

● **বর্তমান কাল**

প্রকার	উত্তমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	প্রথমপুরুষ
সাধারণ/নিত্যবর্তমান	ই	অ, ইস্, এন	এ, এন
ঘটমান বর্তমান	ইতেছি (ছি)	ইতেছ(ছ), ইতেছিস (ছিস), ইতেছেন (ছেন)	ইতেছে (ছে). ইতেছেন (ছেন)
পুরাঘটিত বর্তমান	ইয়াছি (এছি)	ইয়াছ (এছ) ইয়াছিস (এছিস)	ইয়াছে (এছে) ইয়াছেন (এছেন)
বর্তমানের অনুজ্ঞা	×	অ, উন	উক, উন

● অতীত কাল

প্রকার	উত্তমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	প্রথমপুরুষ
সাধারণ/ নিত্য অতীত	ইলাম [লাম, লুম, লেম]	ইলে (লে) ইলি (লি)	ইল (ল) ইলেন (লেন)
নিত্যবৃত্ত অতীত	ইতাম [তাম, তুম, তেম]	ইতে ইতিস্ (তিস)	ইত (ত) ইতেন (তেন)
ঘটমান অতীত	ইতেছিলাম [ছিলাম, ছিলুম, ছিলেম]	ইতেছিলে (ছিলে) ইতিছিলি (ছিলি) ইতেছিলেন (ছিলেন)	ইতেছিল (ছিল) ইতেছিলেন (ছিলেন)
পুরাঘটিত অতীত	ইয়াছিলাম [এছিলাম, এছিলুম, এছিলেম]	ইয়েছিলে (এছিলে) ইয়াছিলি (এছিলি) ইয়াছিলেন (এছিলেন)	ইয়াছিল (এছিল) ইয়াছিলেন (এছিলেন)

● ভবিষ্যৎ কাল

প্রকার	উত্তমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	প্রথমপুরুষ
সাধারণ ভবিষ্যৎ	ইব (ব)	ইবে (বে) ইবি (বি) ইবেন (বেন)	ইবে (বে) ইবেন (বেন)
ঘটমান ভবিষ্যৎ	ইতে থাকিব (তে থাকব)	ইতে থাকিবে (তে থাকবে) ইতে থাকিবি (তে থাকবি) ইতে থাকিবেন (তে থাকবেন)	ইতে থাকিবে (তে থাকবে) ইতেথাকিবেন (তেথাকবেন)
পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ	ইয়া থাকিব (এ থাকব)	ইয়া থাকিবে (এ থাকবে) ইয়া থাকিবি (এ থাকবি) ইয়া থাকিবেন (এ থাকবেন)	ইয়া থাকিবে (এ থাকবে) ইয়া থাকিবেন (এ থাকবেন)
ভবিষ্যতের অনুজ্ঞা	×	ইবে (বে) ইবেন ইও (ও) ইবি (বি) ইস্ (ইস)	ইবে (বে) ইবেন (বেন)